রানা! সাবধান!!

কাজী আনোয়ার হোসেন

মাসুদ রানা



মাসুদ রানা

রানা! সাবধান!!

কাজী আনোয়ার হোসেন

প্রথম প্রকাশ: মে, ১৯৬৮

ভূমিকা

চট্ করে সরে গেল রানা লাস-কাটা ঘরের একটা মোটা থামের আড়ালে।

আবার সেই অস্ফুট গোঙানির শব্দটা কানে এল ওর। ব্যাপার কি? অন্ধকারে কিছুই ঠাহর করা যাচ্ছে না ভালমত। কিন্তু আওয়াজটা যে ব্যারাকের মধ্যে থেকেই এসেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

লাস-কাটা ঘরের ঠিক পিছনেই অফিসারস্ ব্যারাক। আজই সন্ধ্যায় ব্যারাকটা খালি করে বারোজন ভারতীয় সামরিক অফিসার চলে গেছে হাসপাতাল ছেড়ে নয়াদিল্লী- রানা নিজের চোখে দেখেছে। সেই ফাঁকা ব্যারাকের মধ্যে মানুষের গলার আওয়াজ কেন? কে কাতরাচ্ছে ওখানে? কোনও ট্র্যাপ? ধরা পড়ে গেল সে?

সন্তর্পণে চাইল রানা চারপাশে। সময়টা উনিশশো পঁয়ষট্টি সালের চৌঠা অক্টোবর। যুদ্ধ-বিরতি ঘোষণার পর থেকেই ধীরে ধীরে তুলে ফেলছে ওরা আম্বালা হাসপাতাল-ঘেরা অস্থায়ী সৈন্য-শিবির। কিন্তু প্রহরার ব্যবস্থায় ঢিলেমি নেই একবিন্দু। দূরে সাব-মেশিনগান হাতে কয়েকজন সেন্ট্রি দাঁড়িয়ে আছে পাথরের মূর্তির মত। শিবিরের চারদিকে উঁচু তারের বেড়া। দশ হাত অন্তর অন্তর বেড়ার গায়ে পাঁচশো পাওয়ারের বালব ঝুলিয়ে দিয়ে দুর্ভেদ্য করা হয়েছে। তার ওপর আটজন সশস্ত্র সেন্ট্রি সর্বক্ষণ টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে পুরো এলাকা।

আবার এল শব্দটা। সেইসাথে অস্পষ্ট একটা ধস্তাধস্তির আওয়াজ।

অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে নিঃশব্দ পায়ে এগোল রানা ব্যারাকের দিকে। ব্যারাকের ভিতরে আলো নেই। কিন্তু সামনের খানিকটা অংশে আলো পড়েছে একপাশ থেকে। বুকে হেঁটে পার হয়ে এল রানা জায়গাটুকু। এইবার স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে সে ধস্তাধস্তির আওয়াজ। একটা খোলা জানালার সামনে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল রানা। ঘরের ভিতর চেয়েই চক্ষুস্থির হয়ে গেল ওর।

ওপাশের খোলা দরজা দিয়ে আলো এসে পড়েছে ঘরের ভিতর। অনায়াসে চিনতে পারল রানা। সেই মুসলমান নার্সটা। ভয়ে বিস্ফারিত মেয়েটির চোখ। ছটফট করছে সে। মুখ বাঁধা। টুকরো টুকরো ছেঁড়া জামা-কাপড় পড়ে আছে সারা মেঝেতে। দুই হাতে মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরে আছে প্রকাণ্ড চেহারার একজন সামরিক অফিসার। ইণ্ডিয়ান আর্মির ক্যাপ্টেন। এক নিমেষে বুঝল রানা ব্যাপারটা। ল্যাঙ মেরে মাটিতে শুইয়ে ফেলল লোকটা মেয়েটিকে, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর ক্ষুধার্ত বাঘের মত। বিচিত্র একরকমের গোঙানি বেরোচ্ছে মেয়েটির গলা দিয়ে। প্রাণপণে আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করছে সে লোকটির জঘন্য লালসার হাত থেকে। দুর্বল হাতে কিল মারছে শক্তিশালী লোকটির পেশীবহুল পিঠে।

নিঃশব্দে জানালা টপকে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল রানা।

চুলের মুঠি ধরে টেনে তোলার আগে কিছুই টের পেল না ক্যাপ্টেন। পরমুহূর্তেই দড়াম করে প্রচণ্ড একটা ঘুসি পড়ল ওর নাকের ওপর। চোখে সর্ষে ফুল দেখছে লোকটা। তারপরই টুঁ শব্দ না করে জ্ঞান হারাল সে তলপেটে রানার হাঁটুর মারাত্মক এক গুঁতো খেয়ে। সেই সাথে ঘাড়ের ওপর পড়ল রানার হাতের তীব্র একখানা জুডো চপ।

পড়ন্ত দেহটা ধরে আস্তে করে মাটিতে নামিয়ে মেয়েটির দিকে ফিরে চাইল রানা।

উঠে বসেছে মেয়েটি। মুখের বাঁধন খুলে ছেঁড়া এক টুকরো কাপড় দিয়ে লজ্জা ঢাকবার চেষ্টা করছে সে, আর বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে আছে রানার দিকে। জ্ঞানহীন দেহটা টেনে নিয়ে গিয়ে একটা আলমারির পিছনে লুকিয়ে রেখে ফিরে এল রানা মেয়েটির কাছে।

'কি হয়েছিল?' জিজ্ঞেস করল রানা অনুচ্চ কণ্ঠে উর্দুতে।

'কে তুমি?' পাল্টা প্রশ্ন করল মেয়েটি। কণ্ঠস্বরে বোঝা গেল আতঙ্ক কাটেনি ওর।

'আমার প্রশ্নের জবাব দাও। তুমি এখানে এলে কি করে?'

'সিস্টার ললিতা আমাকে এইখানে দেখা করতে বলেছিলেন ওঁর সঙ্গে। ঘরে ঢুকতেই হঠাৎ আক্রমণ করে বসেছে ওই জানোয়ারটা। লোকটা অনেক দিন ধরেই পেছনে লেগে ছিল আমার।'

'সেই সিস্টার কোথায়?' সচকিত হয়ে উঠল রানা। 'আসেনি?'

'না। এখন বুঝতে পারছি আসবেও না। ওই হারামীটার সাথে সাট করেই ফাইনাল সিকিউরিটি চেকাপের দোহাই দিয়ে আমাকে এখানে পাঠিয়েছে সিস্টার ললিতা। নইলে স্টেশনের পথে রওনা হয়ে যেতাম আমি এতক্ষণে। কিন্তু তুমি কে?'

দ্রুত চিন্তা চলছে রানার মাথার মধ্যে। ক্যাপ্টেনের খোঁজ পড়বে অল্পক্ষণ পরেই। সিস্টার ললিতা জানে কোথায় তাকে পাওয়া যাবে। কাজেই সব

ব্যাপারই প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে। তাই এখন দ্রুত কেটে পড়া দরকার। কিন্তু মেয়েটিকে ছেড়ে যাওয়া চলবে না। কুটি কুটি করে ছেঁড়া জামা-কাপড়ের টুকরো অংশগুলো কুড়িয়ে তুলল রানা মাটি থেকে। ক্যাপ্টেনের খুলে রাখা প্যান্টটা ছুঁড়ে ফেলল আলমারির পিছনে। মেয়েটির দিকে ফিরে বলল, 'জলদি চলে এসো আমার সঙ্গে। যে-কোন মুহূর্তে কেউ এসে পড়তে পারে এই জায়গায়।'

একমুহূর্ত ইতস্তত করল মেয়েটি। কিন্তু রানা ততক্ষণে কয়েক পা এগিয়ে গেছে জানালার দিকে। রানার পিছন পিছন বেরিয়ে এল মেয়েটি জানালা গলে। লাস-কাটা ঘরের পিছনে চলে এল ওরা।

'তুমি মুসলমান?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ।'

'কি নাম?'

'শায়লা ফৈয়াজ।'

'এই হাসপাতালের নার্স?'

'আসলে আমি মেডিক্যাল কলেজে থার্ড ইয়ারের ছাত্রী। যুদ্ধ বাধার সঙ্গে সঙ্গে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে এই হাসপাতাল নিয়ে নিয়েছে মিলিটারি। ছাত্রীদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে নার্সের কাজ করতে হয়েছে এতদিন। আজ আমি ছুটি পেয়েছি। দিল্লীতে আব্বাজীর কাছে ফিরে যাচ্ছিলাম, এমনি সময় টেলিফোনে খালি ব্যারাকের মধ্যে দেখা করবার আদেশ দিলেন সিস্টার ললিতা।'

'সিস্টার ললিতা...মানে ওই অপূর্ব সুন্দরী নার্সটা তো?'

'হ্যাঁ।'

'খুব ক্ষমতা ওর, তাই না?'

'হ্যাঁ। নার্সের ছদ্মবেশে আছেন, আসলে আমার যতদূর বিশ্বাস, ইণ্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের লোক উনি।'

দ্রুত চিন্তা চলল রানার মাথার মধ্যে। রানার ধারণাও তাই। সিস্টার ললিতা আসলে ইণ্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। অল্পক্ষণেই খোঁজ পড়বে ক্যাপ্টেনের। ব্যারাকের মধ্যে খুঁজতে লোক পাঠাবে ললিতা। ওখানে শায়লা বা ক্যাপ্টেনকে পাওয়া না গেলে অবাক হবে। নিজে খোঁজ করবে। জ্ঞানহীন বা মৃত যাই হোক, দেহটা পেলেই এলার্ম সাইরেন বাজিয়ে গেট বন্ধ করে সার্চ আরম্ভ হবে। কিন্তু সেটা কতক্ষণ পর? হাতে কতক্ষণ সময় আছে আর?

'তুমি কে তা তো বললে না?' আবার প্রশ্ন করল শায়লা রানার চিন্তার সূত্র ছিন্ন করে দিয়ে। রানার সহানুভূতিশীল সস্নেহ কথাবার্তায় অনেকখানি আশ্বাস পেয়েছে সে। অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে সে এখন। অন্ধকারে

ওর প্রায়-নগ্ন দেহ দেখতে পাচ্ছে না রানা- এটাও ওর স্বস্তিবোধের একটি কারণ।

'আমার নাম রানা। মাসুদ রানা। আমি একজন পাকিস্তানী স্পাই।'

বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে গেল শায়লার চোখ। পাকিস্তানী স্পাই সে জীবনে দেখেনি কোনদিন। দুই চোখে ওর অবিশ্বাস। যদি তাই হবে, তাহলে এত সহজে নিজের পরিচয় দেবে কেন লোকটা?

'এই শিবিরের মধ্যে ঢুকলে কি করে? আর কেনই বা...'

'গত দু'দিন ধরে আছি আমি এই হাসপাতালে। আমি এসেছি তিনজন আহত বন্দী পাকিস্তানী অফিসারকে এদের হাত থেকে মুক্ত করে পাকিস্তানে ফেরত নিয়ে যেতে।'

'আমরা তো শুনলাম শিগগিরই বন্দী বিনিময় হচ্ছে।'

'হচ্ছে। কিন্তু এরা যে লিস্ট পাঠিয়েছে তার মধ্যে এই তিনজনের নাম নেই।'

'অথচ তারা জীবিত অবস্থায় বন্দী হয়ে আছে এখানে?'

'হ্যাঁ। ভারত এদেরকে ফেরত দিতে চায় না, কারণ এদের ওপর নির্যাতন করলে পাকিস্তানের বহু মূল্যবান সামরিক তথ্য ওদের জানা হয়ে যাবে। এবং একই কারণে ছলে-বলে-কৌশলে ওদের উদ্ধার করা পাকিস্তানের এত দরকার। আমাদের সবকিছু ঠিকঠাক। আজই রাতে আমরা পালিয়ে যাচ্ছি এখান থেকে।'

'এসব কথা আমাকে বলছেন কেন? কি করে ভাবলেন আমি বিশ্বাসযোগ্য, আপনাদের পালিয়ে যাবার কথা প্রকাশ করে দেব না? অজানা-অচেনা একটা মানুষকে কি এতসব কথা বলে ফেলা উচিত হলো আপনার? যদি ধরিয়ে দিই?'

মৃদু হাসল রানা মেয়েটির সরলতা দেখে। বলল, 'তোমাকে বললে আমাদের কোন ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই।'

'কেন?' রানার সহজ যুক্তিটা বুঝতে পারল না শায়লা।

'কারণ তুমিও যাচ্ছ আমাদের সঙ্গে। অন্তত এই শিবির থেকে না বেরোনো পর্যন্ত তোমাকে কাছ-ছাড়া করছি না আমি,' নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল রানা।

'আমি যদি না যাই আপনাদের সঙ্গে? যদি চিৎকার আরম্ভ করি? গায়ের জোরে নিয়ে যাবেন আমাকে?' হঠাৎ ফুঁসে উঠল শায়লা।

'না। ওষুধের জোরে।' পকেট থেকে একটা শিশি বের করে দেখাল রানা শায়লাকে। 'নয় নম্বর ওয়ার্ডের বাকি সবাইকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি। তোমাকে সব কথা খোলাখুলি বললাম যাতে ওষুধ প্রয়োগের সময় অনর্থক বাধা সৃষ্টি না করো। প্রয়োজন হলে বল প্রয়োগ করব। কিন্তু তার কি দরকার

হবে?’

এ প্রশ্নের উত্তর দিল না শায়লা। তিক্তকণ্ঠে বলল, ‘তাই বলুন। একতিলও বিশ্বাস করেননি আপনি আমাকে। আমি শত্রু হই বা মিত্র হই কিছুই এসে যায় না আপনার। বন্দী আমি। তাই সবকথা গড়গড় করে বলে গেছেন। অথচ আমি ভেবেছিলাম…’ শেষের দিকে স্পষ্ট অভিমান প্রকাশ পেল শায়লার কণ্ঠে।

‘এই দ্যাখো। পাগলী একটা। ব্যস, রাগ হয়ে গেল? একটু আগে না তুমিই আমাকে বকছিলে সবকথা বলার জন্যে? বোঝাবার চেষ্টা করছিলে, আরও সাবধান হওয়া উচিত আমার? আসলে এখানে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্নই ওঠে না। শত্রু শিবিরে ধরা পড়লে কেবল আমি নই, আরও তিনজন অফিসারের প্রাণ যাবে। তাই কোন রকম ঝুঁকি নেয়ার কথাই উঠতে পারে না। তোমাকে ফেলে রেখে যেতে পারি না আমরা। তুমিই একটু ভেবে দেখো…’

‘আমি কিচ্ছু ভাবতে চাই না। আপাতত একটা কাপড়ের ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন? উলঙ্গ হয়ে শীতে কাঁপব আর কতক্ষণ?’

‘ছি, ছি। আমার আগেই লক্ষ করা উচিত ছিল। এক্ষুণি বেড-শীট জোগাড় করে দিচ্ছি একটা।’

শায়লাকে নিয়ে মর্গের মধ্যে ঢুকে পড়ল রানা। ওপাশের দরজা খুললেই নয় নম্বর ওয়ার্ড। আসলে ওটা ছিল ডিস্‌পেন্সারি, দেয়ালের তাকে নানান সাইজের ওষুধ-পত্র আর কেমিক্যালসের বোতল সাজানো আছে এখনও। স্থানাভাবে এখানেও বেড পাততে হয়েছে, ডিস্‌পেন্সারি সরিয়ে নেয়া হয়েছে অন্যত্র।

শায়লাকে একটা মড়ার খাটিয়ার ওপর চুপচাপ বসে থাকতে বলে সাবধানে দরজা খুলে ঢুকে পড়ল রানা ওয়ার্ডের ভিতর। আটজন ভারতীয় সেনা অকাতরে ঘুমাচ্ছে। তিনজন পাকিস্তানী অফিসার চোখ মেলে চাইল।

‘বিশ মিনিটের মধ্যে এসে যাবে ট্রাক। সবকিছু ঠিকঠাক, কোন চিন্তা নেই,’ বলল রানা মৃদুকণ্ঠে বয়োজ্যেষ্ঠ অফিসারের বেডের পাশে গিয়ে।

‘শব্দটা কিসের হচ্ছিল?’ জিজ্ঞেস করলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল আজাদ।

‘ও কিছু নয়। একটা মুসলমান নার্সের ইজ্জত নষ্ট করবার চেষ্টা করছিল একজন ক্যাপ্টেন মুখ বেঁধে নিয়ে। বস্তা বানিয়ে রেখে দিয়েছি ব্যাটাকে আলমারির পিছনে।’

‘ঠিক করেছেন। মেয়েটা কোথায়?’

‘মর্গে বসিয়ে রেখে এসেছি। ওকে নিয়ে যাচ্ছি আমরা। গোলমাল করবে বলে মনে হয় না। তবু অজ্ঞান করে নিয়ে যাব।’

‘কিন্তু খাটিয়া তো মাত্র চারটে। নেবেন কি করে?’

'আমাদের একজনের সঙ্গে ভরে নেব। অসুবিধে হবে না। কিন্তু বেচারী প্রায় সম্পূর্ণ উলঙ্গ- শীতে কষ্ট পাচ্ছে। বিছানার চাদর দরকার।'

বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে আহত কর্নেল নিজের বিছানার চাদরটা দিয়ে দিলেন। চাদরটা বগলদাবা করে তিন পা অগ্রসর হয়েছে রানা, ঠিক এমনি সময়ে ঝটাং করে খুলে গেল ওয়ার্ডের সামনের দিকের দরজা। পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল রানা। দরজার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে অপূর্ব সুন্দরী সেই নার্স। সিস্টার ললিতা। একা। ডান হাতে পয়েন্ট টু-ফাইভ ক্যালিবারের ছোট্ট একটা অ্যাসট্রা পিস্তল। লোলুপ দৃষ্টিতে সোজা চেয়ে আছে পিস্তলটা রানার বুকের দিকে।

'মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াও, মিস্টার। চাদরটা ফেলে দাও মাটিতে।'

নীরবে আদেশ পালন করল রানা। কয়েক পা এগিয়ে এল ললিতা ঘরের মধ্যে।

'এইবার সোজা বেরিয়ে এসো বাইরে। গুলি করতে একটুও দ্বিধা করব না। কাজেই সাবধান।'

নড়ে উঠল লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল আজাদ। ক্লিক করে পিস্তলের সেফটি ক্যাচটা নেমে গেল। ডানহাতের ইঙ্গিতে নড়তে মানা করল রানা লেফটেন্যাণ্ট কর্নেলকে। বলল, স্পরাজয়টা স্বীকার করে নেয়াই ভাল, স্যার। এখন কিছু করতে গেলে অনর্থক গুলি খেয়ে মরতে হবে। চলুন, সিস্টার, কোথায় নিয়ে যাবেন চলুন। আরও লোকজন নিয়ে এলেই পারতেন, একা কি আমাকে সামলাতে পারবেন?'

কোনও জবাব দিল না ললিতা বটব্যাল। এক পা এগিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে হোঁচট খেলো রানা মাটিতে ফেলা বিছানার চাদরে। দেখল একচুলও কাঁপল না ললিতার হাতের পিস্তল- তেমনি স্থির অবিচল চেয়ে আছে সেটা রানার দিকে। ললিতার মুখে বিচিত্র এক টুকরো হাসি। কাছে এসে দাঁড়াতেই পিছন থেকে রানার শিরদাঁড়ার ওপর পিস্তলটা ঠেসে ধরে দক্ষ হাতে পরীক্ষা করে দেখল সে রানার কাছে কোন অস্ত্র আছে কিনা। নেই।

রানা বুঝল আগামী কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই করতে হবে যা করার। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল নিরাপদ দূরত্বে সরে গেছে ললিতা। ঘুরে দাঁড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে সে? কিন্তু ততক্ষণে ঝাঁঝরা হয়ে যাবে সে গোটা তিনেক গুলি খেয়ে। কিন্তু তবু চেষ্টা করে দেখতে হবে। কয়েক পা এগিয়ে দেহের সমস্ত পেশীগুলো শক্ত করে যেই ঝাঁপ দিতে যাবে, ঠিক সেই সময় ঘটল ঘটনাটা।

ঝন্ ঝন্ করে ভেঙে গেল লাস-কাটা ঘরের দরজার কাঁচ।

ঝট্ করে ফিরল রানা। এক পলকের জন্যে শায়লার অর্ধ নগ্ন দেহটা চোখে পড়ল ওর। বেরিয়ে এসেছে সে। ললিতাও পিছন ফিরে চেয়েছে।

কিন্তু পিস্তলটা ধরা আছে রানার দিকেই। ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা এক মুহূর্ত দেরি না করে।

গুলি করল ললিতা।

এত কাছ থেকে গুলি খাওয়ার অভিজ্ঞতা নেই রানার। কণ্ঠার হাড়ের ঠিক নিচ দিয়ে ঢুকল গুলি। মনে হলো যেন কেউ হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করেছে জায়গাটায়। মাথাটা ঘুরে উঠল ওর। দেহটাও ঘুরে গেল আধপাক। আবার গুলি করল ললিতা। ছিট্‌কে গিয়ে দেয়ালের সঙ্গে ধাক্কা খেল রানা। মাথাটা বাড়ি খেল জোরে দেয়ালে বসানো তাকের সঙ্গে - ঠুন ঠুন করে ঠোকাঠুকি খেলো কয়েকটা বোতল।

ততক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেছে শায়লা মর্গের ভিতর। এগিয়ে এল ললিতা রানার দিকে। দুই চোখে ওর গোক্ষুরের বিষ। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে রানার মুখ। বুক আর হাত ভেসে যাচ্ছে তাজা খুনে। আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে দুই হাত ওপরে তুলে রাখল সে বহু কষ্টে।

'আর কে কে আছে তোমার সঙ্গে? বলো! নইলে...' এক বিজাতীয় ঘৃণায় কুঁচকে গেল ললিতার মুখ। গায়ের সাথে সেঁটে এসেছে সে। পিস্তল ধরা হাতটা কাঁপছে উত্তেজনায়।

রানা বুঝল যে কোন অজুহাতে হোক না কেন, খুন করবে ললিতা ওকে। দেখল, ট্রিগারের ওপর ফর্সা একটা আঙুলের চাপ বাড়ছে, সাদা হয়ে গেছে নখটা। বুকে অসহ্য ব্যথা। জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে সে এক্ষুণি।

'বলো, আর কে আছে?'

রানার হাতে ঠেকল একটা কাঁচের জার। ঝিমিয়ে আসছে ওর সর্বাঙ্গ। কিন্তু শেষ চেষ্টা করবে না সে একবার? বিনা বাধায় মৃত্যুবরণ করবে? দেহমনের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে বোতলটা তুলেই মারল রানা মেয়েটির মাথায়।

ভেঙে চুর হয়ে গেল পাতলা কাঁচের বোতল। একরাশ তরল পদার্থ নেমে এল কপাল বেয়ে চোখে-মুখে নাকে। সঙ্গে সঙ্গে বীভৎস ফোস্কায় ভরে গেল ললিতার অপরূপ সুন্দর মুখটা।

তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার বেরিয়ে এল ললিতার মুখ থেকে। পিস্তল ফেলে দিয়ে দুইহাতে চোখ ঢাকল সে। এমনি সময় পিছন থেকে দ্রুত এগিয়ে এসে একখানা মড়ার খাটের পায়া ভাঙল শায়লা ওর মাথার ওপর।

পড়ে গেল ললিতা। রানাও পড়ল ওর ওপর। ডান হাতটা জ্বালা করছে। অসহ্য হয়ে উঠেছে বুকের ব্যথাটা। হাঁ করে শ্বাস নেবার চেষ্টা করছে রানা এখন। চোখে আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না সে, একটা কালো পর্দা ঝুলছে যেন চোখের সামনে। মাথা ঝাড়া দিয়ে পর্দাটা সরিয়ে ফেলবার চেষ্টা করল রানা। কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে জ্ঞান হারাল।

কারা যেন কথা বলছে ওর চারপাশে। জোর করে চোখ খুলল সে। তিন ফুট দূরে একটা মুখের ওপর নজর পড়ল ওর। কিছুক্ষণ আগেই অপূর্ব সুন্দর ছিল সে মুখ। এখন বিচ্ছিরি ঘায়ে ভরে গেছে মুখটা, ছোট ছোট বুদ্বুদ উঠছে এখনও। কন্‌সেন্‌ট্রেটেড সালফিউরিক এসিড ছিল বোতলের মধ্যে।

বিছানার চাদর দিয়ে লজ্জা নিবারণ করেছে শায়লা। তিনজন পাকিস্তানী অফিসার ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে রানাকে।

'এঁকে মর্গের মধ্যে নিয়ে চলুন, ব্যাণ্ডেজ করতে হবে। আর একজন এই মেয়েলোকটাকে ওই খাটের তলায় লুকিয়ে ফেলুন,' হুকুম দিল শায়লা।

'আহা! সাবধানে তুলবেন যাতে জখমে চাপ না পড়ে।'

মাথাটা উঁচু করায় শরীরটা বাঁকা হলো একটু। জ্ঞান হারাল রানা আবার।

জ্ঞান ফিরল রানার লাস-কাটা ঘরে। বুকে অসহ্য ব্যথা। ডান হাতের আঙুলের মাথাগুলো পর্যন্ত টনটন করছে। কোমর থেকে উপরের অংশটুকু যেন অবশ হয়ে গেছে।

'নড়ো না।' এগিয়ে এল শায়লা একটা সিরিঞ্জ হাতে। 'দুটো গুলিই শরীরের মধ্যে রয়েছে। এই জখমে অবশ্য মরবে না তুমি। ব্যাণ্ডেজ করে দিয়েছি জখমগুলো। এখন এই ইঞ্জেক্‌শনটা দিলেই ব্যথা কমে যাবে।'

রানার বাম হাতের আস্তিন গুটিয়ে সুচ ফুটাল শায়লা।

'ট্রাক এসে গেছে?' জিজ্ঞেস করল রানা। জিভটা নড়তে চাইছে না মুখের মধ্যে, ভারি হয়ে গেছে। নিজের কাছেই কর্কশ ঠেকল নিজের কণ্ঠস্বর।

'এসেছে। ওরা আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়,' জবাব দিলেন উইং কমাণ্ডার রশিদ।

'গুলির শব্দ শুনে কেউ আসেনি? কোনও গার্ড...' আবার প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল রানা, বাধা দিল শায়লা।

'এত কথা বলা ঠিক হচ্ছে না তোমার। এসেছিল। ক্যাপ্টেন সুখলালের ইউনিফর্ম খুলে এনেছিলাম ব্যারাক থেকে, ওটা গায়ে চড়িয়ে ওদের ফিরিয়ে দিয়েছেন কর্নেল আজাদ।'

মর্গের পিছন-দরজা দিয়ে ঢুকল ড্রাইভারের ছদ্মবেশে পি. সি. আই. এজেন্ট সলীল সেন। দীর্ঘ পদক্ষেপে রানার পাশে এসে দাঁড়াল, ঝুঁকে পড়ে পরীক্ষা করল জখমগুলো।

'কেমন বোধ করছ, রানা?' জিজ্ঞেস করল সে।

'খুব খারাপ। জলদি করতে হবে, সলীল। ঝট্‌পট্‌ বেঁধে ফেলো সবাইকে।'

দুই মিনিটের মধ্যে তিনজন অফিসারকে সাদা কাপড় দিয়ে মুড়ে

খাটিয়ায় শুইয়ে ফেলা হলো। দু'জন অ্যাসিসট্যান্ট নিয়ে গেল খাটিয়াগুলো এক এক করে।

'এবার তোমার পালা, রানা। টহলদার সেন্ট্রি এসে পড়তে পারে যে-কোন মুহূর্তে। কিন্তু খাট তো আর মাত্র একটা- মানুষ দেখতে পাচ্ছি দু'জন...'

'আমাকে মাসুদ রানার সঙ্গে জড়িয়ে বেঁধে নিন,' বলল শায়লা।

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে রানার দিকে চেয়ে চোখ টিপল সলীল। রানা মাথা নাড়তেই শায়লার দিকে চেয়ে বলল, 'নিন শুয়ে পড়ুন ওই চাদরের ওপর। তুমি দাঁড়াও রানা, আমি ধরছি।'

রানাকে ধরে নামিয়ে আনল সলীল যত্নের সঙ্গে। লাস-কাটা ঘরটা দুলে উঠল রানার চোখের সামনে। দাঁতে দাঁত চেপে রাখল সে। শুয়ে পড়ল শায়লার পাশে।

'আমাকে অজ্ঞান করে নিলে ভাল হত না?' জিজ্ঞেস করল শায়লা মৃদু কণ্ঠে।

'না!' জবাব দিল রানা।

মাথা এবং পায়ের দিকটা গিঁট দিয়ে বেঁধে ট্রাকে তোলা হলো রানা আর শায়লাকে। অন্যরা আগেই উঠে পড়েছে। সগর্জনে স্টার্ট হয়ে গেল এঞ্জিন। ছুটে চলল রাস্তা ধরে। কিছুদূর গিয়ে থামল একবার। প্রথম চেকপোস্ট। সলীলের কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া গেল। আবার এগোল ট্রাকটা। দ্বিতীয় চেকপোস্টেও থামল, আবার চলল। এবার আধমাইল দূরে মেইন গেট। ব্যস।

হঠাৎ জোরে ব্রেক কষল ট্রাকটা। খটাখট্ বাড়ি খেলো খাটিয়াগুলো পরস্পরের সঙ্গে। রাস্তার ওপর টায়ার ঘষার তীক্ষ্ণ শব্দ হলো কয়েক সেকেণ্ড, তারপর মাঝপথে থেমে দাঁড়াল ট্রাক।

ভারি বুটের শব্দ শুনেই বুঝতে পারল রানা কি ব্যাপার। সলীলের উঁচু গলা শোনা গেল।

'লাস, স্যার। মড়া।'

'কাদের লাস?' মোটা কর্কশ গলায় প্রশ্ন করল কেউ। 'অনেকগুলো দেখা যাচ্ছে?'

'হিন্দুর লাস। চারটে। এই যে, স্যার, নাম ধাম পিতৃপরিচয় সব লেখা আছে এই কাগজে।'

'এত রাতে লাস সরানো হচ্ছে কেন এখান থেকে?'

'আমরা, স্যার, হুকুমের চাকর। হুকুম পালন করছি। তবে মনে হয় একজন ব্রিগেডিয়ারের লাস আছে বলেই এত স্পেশাল ব্যবস্থা। পাতিয়ালা

হেড কোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এই লাস।'

'তোমাদের কাগজ-পত্র আর আইডেন্টিটি কার্ড দেখাও দেখি আরেকবার।'

'নিশ্চয়ই, স্যার।'

অল্পক্ষণ নীরবতা। তারপর আবার কথা বলে উঠল অফিসার।

'আশ্চর্য! কেন? এত রাতে এগুলো এখান থেকে সরাবার কি মানে? কি আছে এর মধ্যে?'

'লাস, স্যার। মড়া,' অম্লান বদনে বলল সলীল।

'বেশ। আমরা দেখব। রামু আর ভাগোয়ান- তোমরা দু'জন উঠে পড়ো ট্রাকে। মাথার দিকের বাঁধন খুলবে প্রত্যেকটা লাসের। আমি নিজে চেক করব।'

রানার খাটিয়াটাই প্রথম। দু'জন লোক উঠে এসেছে ট্রাকের ওপর। সাদা কাপড়ের ওপর থেকে রানার পা নেড়ে বুঝল ওরা যে, মাথাটা অন্যদিকে। এগিয়ে আসছে ওরা মাথার দিকে। ত্রস্ত হাতে গিঁট খুলে ফেলল একজন। রানা বুঝল মরার মত পড়ে থেকেও কোন লাভ নেই- দু'জনকে একখাটে দেখতে পেলেই ধরা পড়ে যাবে ওরা। আর কোন নিস্তার নেই। দম বন্ধ করে রেখেছে সে এতক্ষণ। বুকের ভিতর হাতুড়ির ঘা পড়ছে। বাঁধন আল্‌গা হয়ে যেতেই বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস লাগছে ওর চাঁদিতে, এক্ষুণি সরিয়ে ফেলা হবে কাপড়টা।

'একটু দাঁড়ান, স্যার!' সলীলের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল আবার। 'মড়া যদি দেখতে চান, তাহলে ওদেরকে এগুলো পরে নিতে বলুন, স্যার।'

'অ্যাঁ? মাস্ক আর গ্লাভ্‌স্ কেন?'

'আমি হুকুমের চাকর, স্যার। আমাদেরকে এগুলো পরে তারপর লাস ছোঁবার আদেশ দেয়া হয়েছে। কর্নেল রাজগুরুর এটা স্ট্রিক্ট অর্ডার, স্যার। আর কাজ শেষ হয়ে গেলে আমাদের ইউনিফর্মগুলো খুলে দিতে হবে পুড়িয়ে ফেলার জন্যে।'

'অ্যাঁ?' এবার কর্কশ গলার আওয়াজটা কয়েক হাত তফাৎ থেকে আসছে বলে মনে হলো। 'কত নম্বর ওয়ার্ড থেকে তুলেছ মড়াগুলো। কি রোগে মারা গেছে?'

'গুটি, স্যার। বসন্ত। ওই যাকে বলে স্মল পক্স। মা শীতলার দয়া। তেত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডের মড়া, স্যার।'

'রাম, রাম! রাম রাম! ওরে শালা, হারামজাদা। এতক্ষণ বলিস্‌নি কেন, জানোয়ার?'...আরও কয়েক হাত দূরে সরে গেছে কণ্ঠস্বর। 'রামু, ভাগোয়ান! শিগগির লাফিয়ে নামো। আমার দিকে এসো না। তোমাদের ডিউটি অফ- সোজা ব্যারাকে গিয়ে আগে চান করবে। জানোয়ার কোথাকার! পক্সের মড়া

তা আগে বলিসনি কেন?'

'আপনি তো জিজ্ঞেস করেননি, স্যার। তা ছাড়া আমি মনে করেছিলাম আপনি জানেন, স্যার। মাফ করবেন, স্যার…' ততক্ষণে তড়াক করে লাফিয়ে নিচে নেমে গেছে গার্ড দু'জন।

'আবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্যার-স্যার হচ্ছে! গেট আউট! দূর হয়ে যাও ট্রাক নিয়ে। এক্ষুণি! বদমাশ কাঁহিকে!'

'যাচ্ছি, স্যার, মাফ করবেন, স্যার,' বলতে বলতে ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল সলীল সেন।

গাড়িটা চলতে আরম্ভ করতেই খুক্ খুক্ করে হেসে ফেলল শায়লা।

'চুপ! আরেকটা চেকপোস্ট বাকি আছে,' বলল রানা।

তিন মিনিট পর কোনও রকম বাধা বিপত্তি ছাড়াই পাস দেখিয়ে মেইন গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল ট্রাক। ছুটল সোজা দিল্লীর পথে।

মাথার দিকটা খোলাই ছিল। একটানে সরিয়ে দিল শায়লা সাদা কাপড়টা। অসংখ্য তারা মিট মিট করে জ্বলছে পাঞ্জাবের নির্মেঘ আকাশে। ট্রাকের শক্তিশালী এঞ্জিনের একটানা গর্জন। হু-হু করে হাওয়া কেটে দুর্নিবার বেগে সামনে এগিয়ে যাওয়া। মুক্তি!

আলতো করে চুম্বন করল শায়লা রানার কপালে। তারপর উঠে গিয়ে খুলে দিল সবার বাঁধন।

এক

ঠিক সোয়া দু'বছর পরের কথা। আটষট্টি সালের পনেরোই জানুয়ারি। শীতের আমেজ রয়েছে পুরোপুরি।

বিরক্ত মুখে ধীর পায়ে হাঁটছে রানা রেঙ্গ□নের কুখ্যাত অঞ্চলের একটি নির্জন রাস্তা দিয়ে। রাস্তার একপাশে রেল লাইনের ওপর দাঁড়ানো কয়লা বোঝাই অসংখ্য ওয়াগন- অপর পাশে সারি সারি বন্ধ গুদাম ঘর। রানার পরনে নেভি ব্লু কালারের ট্রপিক্যাল স্যুট, মেরুন সিল্কের টাই, আর সোলের ভিতর স্টীলের পাত বসানো কালো অক্সফোর্ড শ্যু।

সকাল এগারোটার রোদ মিষ্টি-মিষ্টি লাগছে- কিন্তু রানার মনটা হয়ে

আছে নিম-তেতো। কিছুতেই বুঝতে পারছে না কি অপরাধ সে করেছে যার জন্যে এই শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে ওকে। কিচ্ছু না, বুড়োর খেয়াল। যতটা সম্ভব খারাপ ভাষায় দুটো গাল দিল সে মেজর জেনারেল রাহাত খানের উদ্দেশে। তারপর রাস্তায় পড়ে থাকা পোয়াটেক ওজনের একখানা কয়লার টুকরোকে মারল কষে এক লাথি। ছিট্‌কে অনেক দূরে চলে গেল সেটা ফ্র্যাগমেন্টেশন বম্বের মত।

একটু হালকা হলো মন। একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে আবার গোড়া থেকে ভাবতে আরম্ভ করল সে।

কি কাজ? না, সোজা টোকিয়ো যাবে, সেখান থেকে বেইজিং- সেখানে মাসুদ রানার সম্মানে বিশেষ ভাবে আয়োজিত গোটা কয়েক কালচারাল মীটিং-এ পূর্ব পাকিস্তানের লোকগীতির ওপর পৌনে দু'শো লাইনের একটা মুখস্থ বক্তৃতা দেবে (যার বেশির ভাগ শই তার বোধশক্তির বাইরে)- তারপর সাংহাই এবং ক্যান্টনে একই বক্তৃতার পুনরাবৃত্তি করে হংকং আসবে প্লেনে। চোদ্দ তারিখ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় কউলুনের একটা বইয়ের দোকান থেকে একখানা ফ্রেগুস্‌ নট মাস্টারস্‌ কিনবে, পরদিন সকালে রেঙ্গ□ন পৌঁছে নাম্‌দিং হসপিটালের গেট থেকে দক্ষিণ দিকে গুণে গুণে ছয়শো কদম হাঁটলে যে মোড়টা পড়বে সেই মোড়ের ওপর একটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড বইয়ের দোকানে লাল টুপি পরা সেলসম্যানের কাছে সেটা বিক্রি করে টাকাটা এবং সেইসাথে একটা সীলমোহর করা চিঠি নয়াদিল্লীর একখানা ঠিকানা লেখা খামে পুরে পোস্ট করে দিতে হবে। ব্যস, তারপর সারাদিন ওর ছুটি। এরপর কি করতে হবে জানানো হবে ওকে।

আচ্ছা, কোনও মানে হয়? কাজটা যে-কোনও একটা বাচ্চা ছেলের পক্ষেও সহজ। অথচ এই সাধারণ একটা কাজের জন্যে কি তোড়জোর করে ডেকে আনা হয়েছিল তাকে মেজর জেনারেলের অফিস কামরায়। রানার কোনও ওজর আপত্তি শুনল না বুড়ো। এই কাজের জন্যে তার মাসুদ রানাকেই চাই। ভাবতে ভাবতে আবার গরম হয়ে উঠল রানা। অপমান। নিশ্চয়ই অপমান করতে চেয়েছে ওকে বুড়ো। অস্ফুট কণ্ঠে আবার একটা গাল দিল রানা বদ্ধকে। কিন্তু কয়লার টুকরো পেল না রাস্তায়। রেললাইনটা বামে সরে গেছে অনেকখানি, তালা ঝুলানো বন্ধ গুদামঘরগুলোও ছাড়িয়ে এসেছে। লক্ষ করেনি রানা- ডানধারে নদী দেখা যাচ্ছে একটা। ঠাণ্ডা মিষ্টি বাতাস এসে লাগল চোখেমুখে। বেশ ভাল লাগল ওর ঠাণ্ডা বাতাসটা।

ঠিক সেই সময়ে ঘটল ঘটনাটা। নিজের চিন্তায় মশগুল ছিল, তাই নির্জন রাস্তায় পিছন থেকে তিনজন লোকের দ্রুত নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে আসা দেখতে পায়নি সে। যখন লক্ষ করল তখন দেরি হয়ে গেছে। আরও তিনজন এগিয়ে আসছে রাস্তার ডানধারের একটা প্রকাণ্ড বটগাছের আড়াল থেকে।

ঝট্‌ করে ঘুরে দাঁড়াল রানা নিজের অজান্তেই- ঝাঁকি দিয়ে মাথাটা

সরিয়ে নিল একপাশে। প্রথম বাড়িটা পড়ল ডান কাঁধের ওপর। শক্ত মোটা হান্টার। অবশ হয়ে গেল ডান হাত। সাথে সাথেই প্রচণ্ড এক মুষ্ট্যাঘাত এসে পড়ল ওর বাম চোয়ালে। টলে উঠল দুনিয়াটা রানার চোখের সামনে। ডানধারের তিনজনও এসে পড়েছে।

শোলডার হোলস্টারে রাখা পিস্তলটা বের করবার চেষ্টা করল রানা- কিন্তু ডানহাতটা তুলতেই পারল না উপরে। কোন রকম চিন্তা-ভাবনার সময় নেই। আত্মরক্ষা করতে হবে। পাশ থেকে একজনের ধাক্কায় ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিল রানা, সেই অবস্থাতেই প্রাণপণ শক্তিতে লাথি মারলো সে একজনের তলপেটে। ইচ্ছে ছিল মাটিতে পড়ে আরও কয়েকটা লাথি চালাবে এবং কোন এক সুযোগে পিস্তলটা বের করে ফেলবে। কিন্তু তা আর হলো না। মাঝ পথেই ধরে ফেলল একজন ওকে। নাকের ওপর রাবারের কি একটা জিনিস চেপে ধরল আরেকজন। দম বন্ধ করে রাখবার চেষ্টা করল রানা। কিন্তু পেটের উপর ধাঁই করে এক কিল পড়তেই বাধ্য হলো সে শ্বাস নিতে। কয়েক সেন্টিমিটার ইথাইল ক্লোরাইড এবং অক্সিজেন ঢুকে গেল রানার ফুসফুসে। অন্ধকার হয়ে এল চারদিক, রানার মনে হলো অতল সমুদ্রে তলিয়ে যাচ্ছে সে ক্রমশ। আরও অনেক গভীরে নামিয়ে দিল রানাকে ওরা মরফিনের একটা ইন্ট্রাভেনাস ইঞ্জেকশন দিয়ে।

শক্তিশালী ইকো ১০ ক্ষ ৫০ বিনকিউলারটা চোখ থেকে নামিয়ে ভয়ঙ্কর এক বাঁকা হাসি হাসল আধমাইল দূরে একটা বাড়ির ছাতে দাঁড়ানো একজন ধুতি-পাঞ্জাবী-জহরকোট পরিহিত কুৎসিত চেহারার লোক।

ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে এল রানার। কপালের দুই পাশটা টিপ-টিপ করছে। মাথাটা ধরে আছে। জিভ, কণ্ঠতালু শুকিয়ে কাঠ। চোখ না খুলেই অনুভব করল, দুলছে সে শুয়ে শুয়ে। কুল-কুল শব্দ শোনা যাচ্ছে পানির। জলপথে কোথাও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওকে। কোথায়?

কারা এরা? রেড লাইটনিং টং? না দস্যু উ সেনের লোক? নাকি অন্য কোন দল? কোথায় ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওকে? কেন?

চোখের পাতা সামান্য ফাঁক করে চাইল রানা। কেউ নেই। এবার আর একটু ফাঁক করে চাইল সে এদিক-ওদিক। একটা লঞ্চের কেবিনে মেঝের ওপর শুয়ে আছে সে। বাইরে প্রখর রোদ্দুর। ঘরে কেউ নেই। একটা কম্বল দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে ওকে। বাজে কয়টা?

উঠে বসতে গিয়ে বুঝতে পারল রানা ঘরে কোন লোক নেই কেন। একখানা লোহার খাটের পায়ার সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে ওর দুই হাত। তার ওপর ওর সমস্ত জামা-কাপড় খুলে নেয়া হয়েছে গা থেকে। পা-দুটো নাড়িয়ে দেখল সে, খোলাই আছে। জুতো জোড়াও পরাই আছে পায়ে। আশার

আলো জ্বলে উঠল ওর মনের ভিতর। দুই মিনিটে হাতের বাঁধন খুলে ফেলতে পারবে সে।

জুতো সুদ্ধ ডান পা-টা কম্বলের তলা থেকে বের করে ভাঁজ করে মুখের কাছে নিয়ে এল রানা। অল্প একটু চেষ্টার পরই দাঁতের ফাঁকে চলে এল জুতোর সোলে লুকিয়ে রাখা ছুরিটা। ঠিক সেই সময় ডেকের ওপর বুটের শব্দ শুনতে পেল সে। চট্ করে ছেড়ে দিল সে ছুরি; পিঠের তলায় নিয়ে নিল সেটাকে। কম্বলটা যতটা সম্ভব গায়ের ওপর ঠিক করে নিয়ে পড়ে থাকল সে চোখ বন্ধ করে। খুলে গেল কপাট।

দুই আঙুলে চোখের পাতা টেনে পরীক্ষা করল লোকটা। আবছা মত দেখতে পেল রানা একটা নোংরা মঙ্গোলিয়ান মুখ। ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে থাকায় দুইসারি নোংরা হলুদ দাঁত দেখা গেল- একটা দাঁত আবার সোনা দিয়ে বাঁধানো।

চোখ ছেড়ে দিয়ে রানার চুলের ভিতর হাত চালিয়ে দিল এবার লোকটা। এক ঝাঁকিতে আধহাত উঁচুতে উঠে গেল রানার মাথা, ঠাস করে চড় পড়ল গালে। টুঁ শব্দ না করে সহ্য করে নিল রানা। মাথাটা ঝুলতে থাকল চুলের মুঠি ধরা হাত থেকে।

কি যেন গালি দিল লোকটা নিজস্ব ভাষায়, তারপর ছেড়ে দিল চুল। ঠাস করে মেঝেতে ঠুকে গেল রানার মাথা। হাতের বাঁধন পরীক্ষা করল লোকটা টেনে টেনে। পায়ের শব্দটা দূরে সরে গেল। দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল কেবিনের দরজা। মিলিয়ে গেল পদশব্দ।

ধীরে ধীরে চোখ মেলে চাইল রানা। মিটমিট করে দু'ফোঁটা পানি ঝরিয়ে ফেলল চোখ থেকে। এবার আবার স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে সবকিছু। দ্রুত কাজ সারতে হবে। এরা যারাই হোক, কুটুম বাড়ির দাওয়াত খাওয়াতে যে নিয়ে যাচ্ছে না ওকে সেটা স্পষ্ট। অত্যন্ত শক্তিশালী কোনও দল। এদের প্রতিটি কাজে যেমন বিদ্যুৎ বেগ তেমনি নিখুঁত পারদর্শিতা।

আধ মিনিটের মধ্যেই হাতের বাঁধন খুলে গেল রানার। ছুরিটা রেখে দিল যথাস্থানে। উঠে দাঁড়াতে যাবে ঠিক এমনি সময় পিছন থেকে কথা বলে উঠল একজন লোক।

'চমৎকার! ভাল ট্রেনিং পেয়েছ তুমি, হে ছোকরা।'

চমকে ফিরে চাইল রানা। ডানহাতে একখানা কোল্ট অটোমেটিক ধরে দাঁড়িয়ে আছে রানার লাথি খাওয়া দুর্ধর্ষ চেহারার লোকটা। বামহাতে একটা পর্দা ফাঁক করে হাসছে তার ভয়ঙ্কর হাসি। পিস্তলটা স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে রানার কপালের দিকে। রানা বুঝল, ট্রিগার টিপতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না এই লোক। ধীর স্থিরভাবে কম্বলটা টেনে নিয়ে লজ্জা নিবারণ করল সে। তারপর শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমাকে? কে

তোমরা?'

'দুঃখিত। এর উত্তর দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।' দুই পা এগিয়ে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল লোকটা। পিস্তলটা সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখছে রানার ওপর।

'কেন?' আবার প্রশ্ন করল রানা।

মাথা নাড়ল শুধু লোকটা, কোন উত্তর দিল না।

'বাজে কয়টা এখন?' নিজের খালি কব্জির দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল রানা। 'সেটা বলতে আপত্তি নেই নিশ্চয়ই? কতক্ষণ অজ্ঞান ছিলাম আমি?'

'ঘণ্টা চারেক। এখন বাজে সাড়ে তিনটে। রেঙ্গ নের সাড়ে তিনশো মাইল উত্তরে মান্দালয়ে নিয়ে আসা হয়েছে তোমাকে প্লেনে করে। এখন ইরাওয়াদ্দি নদীপথে আরও উত্তরে চলেছ। ব্যস, আর কোন তথ্য জানানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

রানা বুঝল ঘোড়েল লোক। ভুলেও একবার ঘড়ির দিকে চাইল না, পাছে সে একটা কিছু করে বসে।

'আমার ঘড়ি আর জামা-কাপড় খুলে নিয়েছ কেন?'

'যাতে পালাতে না পারো।'

'জামা-কাপড়ের ব্যাপার না হয় বুঝলাম, কিন্তু ঘড়িটা নিয়েছ কেন?'

'দেখো, মাসুদ রানা, তোমার সম্পর্কে সবকিছু জানা আছে আমাদের। ঘড়িটা যুক্তিযুক্ত কারণেই সরানো হয়েছে।'

যেন কিছুই বুঝতে পারেনি, এমনি চোখ করে চেয়ে রইল রানা লোকটার দিকে। কিন্তু কারণ ব্যাখা করার কোন লক্ষণই প্রকাশ পেল না লোকটির মধ্যে। এ নিয়ে আর চাপাচাপি করল না রানা। অন্য পন্থা ধরল সে।

'মাথাটা ভয়ঙ্কর ধরে আছে।'

'দুঃখিত। মাথা ধরার ওষুধ এ লঞ্চে নেই,' বলল লোকটা মৃদু হেসে।

'সিগারেট আছে?'

'না। সিগারেট খাই না আমি।'

'আমার কোটের পকেটে একটা সিগারেট কেস আছে। যদি একটু কষ্ট করে এনে দিতে...'

কোনও উত্তর না দিয়ে মৃদু হাসল লোকটা।

'দরকার মনে করলে হাত দুটো বেঁধে রেখে যাও।'

এবারও কোনও উৎসাহ দেখা গেল না লোকটার। দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল চুপচাপ। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে পিস্তলটা রানার কপালের দিকে।

'তুমি কি মনে করছ সিগারেট আনতে গেলেই এই উলঙ্গ অবস্থায় পালিয়ে যাবো আমি? না হয় আর কাউকে দিয়ে আনিয়ে দাও।'

'না,' শান্ত কণ্ঠে বললো লোকটা। 'তোমার সিগারেট কেস আমরা ভালমত পরীক্ষা করে দেখছি। ওর মধ্যে দুটো সিগারেটে আছে ম্যাগনেশিয়াম বম্ব। আর তোমার ঘড়িটাও ডি-ফিউজ করা হয়েছে। এখন নিশ্চয় বুঝতে পারছ তোমার ব্যাপারে কোনরকম ঝুঁকি কেন নিতে চাইছি না আমি?'

রানা বুঝল, সহজ পাল্লা নয়। এদের চোখে ধুলো দেয়া সহজ হবে না। এবার সোজাসুজি চেষ্টা করল সে।

'আমাকে পালাতে সাহায্য করো, তোমাকে দশ হাজার টাকা দেব-পৃথিবীর যে কারেন্সিতে চাও।'

'তার চেয়ে প্রাণে বেঁচে থাকাটা অনেক সুখের। নয় কি?' বাম হাতের কড়ে আঙুলের নক দিয়ে দাঁতের ফাঁক থেকে কি যেন বের করবার চেষ্টা করছে লোকটা।

এবার প্রাণভরে গালি দিল রানা লোকটাকে। অশ্লীল সব গালি। দেখা যাক রাগিয়ে দিয়ে কোনও সুবিধে হয় কিনা। রেগে গেলে হয়তো কিছু ভুল করবে।

সত্যিই লাল হয়ে উঠল লোকটার হলুদ মুখ। ট্রিগারের ওপর আঙুলের চাপ বাড়ছে, সাদা হয়ে গেছে তর্জনীর নখ রক্ত সরে যাওয়ায়। এখন যে-কোনও মুহূর্তে গুলি করবে লোকটা। ওর হাতের দিকে চেয়ে আছে রানা, গুলিটা বেরুবার ঠিক আগের মুহূর্তেই লাফ দেবে সে। সমস্ত পেশীগুলো টান হয়ে গেছে রানার ধনুকের ছিলার মত।

এমনি সময় সামলে নিল লোকটা। হাসবার চেষ্টা করল, কিন্তু দাঁত বেরোল শুধু, হাসি হলো না।

'অপমান করতে চাও, করো। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো, তোমাকে জ্যান্ত রাখার হুকুম আছে আমাদের ওপর। কিন্তু কতখানি জ্যান্ত, সে সম্পর্কে কোন স্পষ্ট নির্দেশ নেই। কাজেই সাবধান। বেশি বাড়াবাড়ি করলে পরে অনুতাপ হবে।'

উঠে দাঁড়াল রানা লোকটার দিকে পিছন ফিরে। জানালার দিকে যাচ্ছিল বাইরেটা দেখবার জন্যে- একটা বড় ঢেউয়ের ওপর পড়ে দুলে উঠল লঞ্চটা। টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যাচ্ছিল রানা। রানার দুরবস্থা দেখে মুচকি হাসি এসে পড়ল লোকটার ঠোঁটে। পরমুহূর্তেই ঝপাৎ করে রানার ছুঁড়ে দেয়া কম্বলটা ঢেকে ফেলল ওর চোখ মুখ। পাগলের মত কম্বল সরাবার চেষ্টা করছে সে। বিদ্যুৎগতিতে কাছে এসে দাঁড়াল রানা। প্রচণ্ড শক্তিতে লাথি মারল সে লোকটার হাঁটুর ওপর। খটাং করে মেঝেতে পড়ল কোল্ট অটোমেটিক। কম্বল সরিয়ে ফেলল লোকটা। ঘাড়ের ওপর পড়ল এসে ভয়ঙ্কর এক জুডো চপ। নিঃশব্দে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল সে মাটিতে।

দুই মিনিটে লোকটার জ্যাকেট আর প্যান্ট খুলে পরে নিল রানা। পিস্তলটা তুলে নিল মেঝে থেকে। তারপর বেরিয়ে এল বাইরে। নদীর তীরটা বেশি দূরে নয়। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল রানা ডেকের ওপর। কেউ নেই। রেলিং টপকে পিস্তলটা পকেটে রাখল সে। হঠাৎ ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল লঞ্চটার। ডাইভ দেবার জন্যে হাত দুটো যেই পিছনে নিয়েছে অমনি পিছন থেকে খপ্ করে ধরে ফেলল কেউ রানার দুই হাত। প্রচণ্ড শক্তি সে হাতে। খেলনার মত তুলে নিয়ে এল রানাকে রেলিং-এর এপারে। ছটফট করছে রানা বড়শি গাঁথা মৃগেল মাছের মত। ধড়াস করে ফেলা হলো ওকে ডেকের ওপর। পিস্তলটা বের করে নেয়া হলো পকেট থেকে। হ্যাণ্ডকাপ পরিয়ে দেয়া হলো হাতে। তারপর টেনে দাঁড় করিয়ে প্রচণ্ড জোরে এক থাবড়া মারা হলো ওর নাক-মুখ লক্ষ্য করে। কলকল করে রক্ত বেরিয়ে এল রানার নাক দিয়ে। চোখে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না সে। সেই অবস্থায় ছেঁচড়ে টেনে নিয়ে চলল ওকে লোকটা ডেকের একপাশে।

লঞ্চটা তখন একটা ঘাটে ভিড়েছে। ঝট্পট্ তক্তা বিছানো হলো। রানা দেখল পাঁচ-ছয়জন সশস্ত্র লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে ঘাটে। ধাক্কা দিয়ে নামানো হলো ওকে। কিন্তু লঞ্চ থেকে আর কেউ নামল না। অবাক হয়ে পিছনে ফিরে দেখল রানা উঠিয়ে নেয়া হচ্ছে তক্তা। বুঝল, ওদের কাজ এই পর্যন্তই শেষ। রানাকে ধরে দিয়ে গেল ওরা কারও হাতে। কার হাতে?

পিছন থেকে রাইফেলের নলের গুঁতো পড়ল রানার পিঠে, 'এগোও।'

নদীর তীর থেকে বেশ খানিকটা দূরে প্রকাণ্ড এক প্রাসাদে নিয়ে আসা হলো রানাকে। গেটের কাছে দাঁড়ানো সশস্ত্র প্রহরী। প্রশস্ত একটা ঘরে ঢুকে দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা।

একটা বড় সাইজের সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপাশে চেয়ারে বসে চীনা সংবাদপত্র পড়ছে একজন লোক, মুখটা দেখা যাচ্ছে না। টেবিলের ওপর রানার দিকে মুখ করে রাখা আছে একখানা মাউজার। ধীরে ধীরে সরে গেল কাগজটা মুখের সামনে থেকে।

লালচে ভাসা ভাসা ঘোলাটে চোখ, থ্যাবড়া নাক আর মড়ার মত ফ্যাকাসে ঠোঁট- একজন লোক স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে রানার দিকে।

চেয়ারে বসা লোকটার চেহারায় এমন এক ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর ভাব আছে যে নিজের অজান্তেই একবার শিউরে উঠল রানার সর্বশরীর। মানুষ তো নয়, অশরীরী অতৃপ্ত প্রেতাত্মা যেন একটা। এই লোক করতে পারে না এমন কাজ নেই। ঠাণ্ডা নিস্পৃহ দৃষ্টিটা যেন অন্তস্তল পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে ওর।

আধ মিনিট চুপচাপ রানার দিকে তাকিয়ে থেকে পিস্তলটা তুলে নিল সে হাতে। রানা এদিক-ওদিক চাইল- বসবার কোন ব্যবস্থা নেই। অর্থাৎ চেয়ার তুলে মারার কোন সুযোগ নেই।

'আমার নাম মেজর টিং ফং। আমরা আসামীদের জন্যে বসবার কোন ব্যবস্থা রাখি না।'

'আসামী?' বিস্মিত দৃষ্টিতে চাইল রানা টিং ফং-এর হাতে ধরা মাউজারের দিকে। একটা সাইলেন্সার পাইপ পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে লাগাচ্ছে লোকটা পিস্তলের মুখে।

'সাইলেন্সার ব্যবহার করি আমরা সাধারণত। নইলে বিচ্ছিরি শব্দ হয়।' যেন আপন মনে বলছে টিং ফং। 'চিন্তা করবেন না, আমার হাতের টিপ অব্যর্থ। খুব বেশি কষ্ট হবে না। এখানে এইঘরে আজ পর্যন্ত মোট…'

'এটা কি রেড লাইটনিং টং-এর আস্তানা?' হঠাৎ বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'রেড লাইটনিং টং? নাহ্। আপনি আমাদের টং-এর লোক বলে ভুল করেছিলেন বুঝি?' মুচকে হাসল মেজর টিং ফং। 'আমরা টং নই। আর এই আস্তানাটাও ঠিক আমাদের নয়। আপাতত কয়েকদিনের জন্যে আছি আমরা এখানে। আসলে এটা পাকিস্তান ও চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিসের একটা যৌথ আস্তানা, মেজর মাসুদ রানা।'

উত্তরটা শুনে হতভম্ব হয়ে গেল রানা প্রথমে। তারপর অসম্ভব রাগ হলো ওর। তাহলে এইসব কাণ্ড করবার কি অর্থ?

'আমার হাতকড়া খুলে দিতে বলুন,' বলল রানা কঠোর কণ্ঠে।

কোন উত্তর দিল না ভয়ঙ্কর লোকটা। সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলটা এবার রানার বুকের দিকে সোজা তাক করে ধরল।

'হাতকড়া খুলে দিন, মেজর টিং ফং। নইলে মস্ত বিপদে পড়বেন। কেন আমাকে ধরে আনা হয়েছে এখানে তার জবাবদিহি করতে হবে আপনাকে,' আবার বলল রানা গম্ভীর কণ্ঠে।

লালচে ঘোলাটে চোখ মেলে চেয়ে রইল লোকটা রানার দিকে। এ কথার কোন জবাব দিল না। ঠোঁটের কোণে চাপা বাঁকা হাসি। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বলল সে, 'আমাদের চোখকে আপনি ফাঁকি দিতে পারেননি, মিস্টার মাসুদ রানা। আমরা ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টের বিশ্বাসঘাতক ডাবল্-এজেন্টদের নিয়ে ডিল করি। তাদের খুঁজে বের করে নির্মূল করবার দায়িত্ব আমাদের ওপর।'

পিস্তলটা ঠিক হার্ট বরাবর চেয়ে আছে এখন।

'কোনও দোষী লোক আজ পর্যন্ত আমাদের চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি।' বুড়ো আঙুলের চাপে ক্লিক করে সেফটি ক্যাচ অফ হয়ে গেল।

'দোষী লোক! কি বলছেন আপনি, মেজর…'

'হ্যাঁ, দোষী। যেসব চীনা বা পাকিস্তানী সিক্রেট এজেন্ট নিজ নিজ দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তারাই কেবল আমাদের আসামী।'

'এই জন্যেই কি আমাকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে?' থ হয়ে গেল রানা। 'আমি বিশ্বাসঘাতক?' আবার সেই রাগটা অনুভব করল রানা। ঘাড়ের কাছে কয়েকটা চুল শিরশির করে উঠল। 'অসম্ভব!'

'তাই নাকি?' টিটকারির ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল মেজর টিং ফং। তর্জনীর নখটা সাদা হয়ে আসছে আঙুলটা ট্রিগারের ওপর চেপে বসায়। আবার মুখ খুলল সে।

'ঠিক আপনার মত সবাই অবাক হবার ভান করে। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেও তাদের মুখ থেকে সত্যি কথা বের করা যায় না।'

'মাথা খারাপ হয়ে গেছে আপনার!' রানার দৃঢ় ধারণা, ঠিক তাই হয়েছে লোকটার। 'আমি, মাসুদ রানা... বিশ্বাসঘাতক!'

রানার কথাগুলো যেন শুনতেই পায়নি এমনিভাবে নিজের কথা বলে চলল মেজর টিং ফং।

'মানুষ মাত্রই নির্দোষ, নিষ্পাপ। আমার কপাল ভাল, কে ভাল কে মন্দ সে বিচারের ভার আমার ওপর নেই। আমার কাজ কেবল শাস্তি দেয়া। আমি হুকুমের চাকর।'

লালচে ঘোলাটে চোখ দুটো লাল হয়ে উঠল। জ্বলজ্বল করছে যেন সেগুলো রক্ত পিপাসায়। ট্রিগারের ওপর চাপ বাড়ল আর একটু।

'মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হও, মাসুদ রানা!'

টিপে দিল সে ট্রিগারটা।

দুই

খট্ করে শব্দ হলো কেবল, গুলি বেরোল না পিস্তল থেকে। খনখনে গলায় হেসে উঠল মেজর টিং ফং। উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে।

'মাফ করবেন, মেজর মাসুদ রানা। হাতে সময় আছে, তাই একটুখানি বাস্তব রসিকতা করছিলাম, আমার চীফ একটু ব্যস্ত আছেন, এক্ষুণি ডাক আসবে আপনার, ততক্ষণ...'

টেবিলের ওপর টেলিফোন বেজে উঠল। একটিও কথা না বলে রিসিভার কানে তুলে শুনল সে বিশ সেকেণ্ড, তারপর নামিয়ে রাখল।

'হাত কড়াটা খুলে দাও। চলুন, মেজর রানা। তলব এসেছে চীফের কাছ থেকে। দোতলায় যেতে হবে আমাদের এখন। তোমরা থাকো, তোমাদের আর যেতে হবে না।'

সিঁড়ি দিয়ে উঠেই লম্বা করিডর। তিনটে ঘর ছেড়ে বাঁয়ে গেছে

আরেকটা করিডর। শেষের ঘরটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। দুটো টোকা দিয়ে অনুমতির অপেক্ষা না করেই রানাকে নিয়ে ঢুকে পড়ল টিং ফং ঘরের ভিতর।

ঘরের মেঝেতে পুরু লাল কার্পেট বিছানো। প্রথমেই চোখ পড়ল রানার ঘরের দেয়ালে টাঙানো বিভিন্ন রকমের বন্দুক, রাইফেল, পিস্তল ও রিভলভারের ওপর। মারলিন কারবাইন, মসবার্গ আর উইনচেস্টার রাইফেল, ফারলাখ, ফিনিশ লায়ন, ওয়ালথার, সাকো- কি নেই? আর্জেন্টিনার ব্যালেস্টার মলিনা, ইটালিয়ান গ্লিসেনটিস, সুইডিস লাটিস, আর রাশান ম্যাকারভ- সব রকম আছে। শেষের তাকে সাজানো আছে কয়েকটা টেলিস্কোপিক সাইট, সায়ানাইড ফায়ারিং সিগারেট কেস, টাইম বম্ব ফিট করা মিনিয়েচার ক্যামেরা আর এক্সপ্লোসিভ রিস্টওয়াচ।

তারপরই দেখতে পেল রানা, একটা মস্ত বড় বাঁকা সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপাশে বসে ফাইল ঘাঁটছে একজন লোক। একনজরেই অনায়াসে চিনতে পারল রানা। চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিসের চীফ, অ্যাডমিরাল হো ইন। এবার সত্যি অবাক হলো রানা। এ ভাবে ধরে আনা হলো কেন ওকে?

'আসুন, মেজর মাসুদ রানা।' সহাস্যে স্বাগত জানালেন অ্যাডমিরাল। 'বসুন ওই চেয়ারটায়। টিং ফং, তুমি এখন যেতে পারো। ঠোঁটের ওপর রক্ত দেখেই বোঝা যাচ্ছে যাত্রাটা তেমন উপভোগ্য হয়নি মাসুদ রানার। তাছাড়া সারাটা দিন খাওয়া-দাওয়া হয়নি ওঁর। সেই ব্যবস্থা করো গিয়ে তুমি। দরকার হলেই ডাকব তোমাকে।...কই, বসুন?'

অবাক হয়ে চেয়ে আছে রানা জানালার দিকে। ছিপছিপে লম্বা একজন লোক রানার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে জানালার বাইরে চেয়ে রয়েছে। দাঁতে চেপে ধরা পাইপ থেকে ধোঁয়া উঠছে অল্প অল্প। অ্যাডমিরাল হো ইনের কথা কানে ঢুকল না রানার। হাঁ হয়ে গেল ওর মুখটা। বাইরের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ালেন পাকিস্তান কাউণ্টার ইণ্টেলিজেন্সের চীফ, মেজর জেনারেল রাহাত খান।

দীর্ঘ পদক্ষেপে টেবিলের কাছে চলে এলেন রাহাত খান। অ্যাডমিরাল হো ইনের পাশের চেয়ারটায় বসে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'বসো, রানা।'

বিস্মিত রানা বসল একটা চেয়ারে। মাথার মধ্যে অনেকগুলো চিন্তা একসাথে ভিড় করে এসে গোলমাল করে দিল সবকিছু। কিছুই বুঝতে পারছে না সে। মান্দালয়ে রাহাত খান, হো ইন- এরা কেন? ওকেই বা ছেলে-ভুলানো কাজ দিয়ে রেঙ্গ্নে পাঠানো হয়েছিল কেন? ধরেই বা আনা হলো কেন এমন রূঢ় ভাবে? কি এদের উদ্দেশ্য? মেজর টিং ফং কি ঠিকই বলেছিল? তাকে বিশ্বাসঘাতক বলে সন্দেহ করে এখানে ধরে আনা হয়েছে?

'এসবের কি অর্থ, স্যার?' জিজ্ঞেস করল রানা আহত কণ্ঠে।

'অর্থ আছে। তোমার সব প্রশ্নেরই সদুত্তর পাবে। কিন্তু তার আগে

খাওয়া-দাওয়াটা সেরে নিতে চাও?'

'না, স্যার। এক্ষুণি জানতে চাই আমি কেন এভাবে...'

'আমিই বরঞ্চ শুরু করি, কি বলেন, মেজর জেনারেল?' হঠাৎ বলে উঠলেন অ্যাডমিরাল হো ইন। 'আমার মুখ থেকে শুনলে আঘাতটা কম লাগবে মেজর রানার। মোটামুটি ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, আপনি তলে তলে ভারতের সাথে হাত মিলিয়েছেন, কিংবা অদূর ভবিষ্যতে ওদের পক্ষে কাজ করবেন বলে গোপনে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন, এই সন্দেহ করে আপনাকে এখানে ধরে আনা হয়েছে।'

'আমি কী এমন কাজ করেছি, যার জন্যে আপনাদের মনে এই জঘন্য সন্দেহ?' জিজ্ঞেস করল রানা বিস্মিত কণ্ঠে।

'একটা-দুটো প্রমাণে আমাদের সন্দেহ উৎপন্ন হয়নি, মেজর মাসুদ রানা। অসংখ্য প্রমাণ হাতে আছে আমাদের। কোন্‌টা বলব? ভারতীয় এজেন্টের কাছে পাকিস্তানের অনেক গোপন তথ্য পাচার করেছেন আপনি, বেইজিং-এ চীনা সামরিক ঘাঁটির ছবি তুলে দিয়েছেন ওদের হাতে, ভারতে কার্যরত চীনা ও পাকিস্তানী এজেন্টদের লিস্ট ধরিয়ে দিয়েছেন ওদের হাতে...কত বলব? সব রিপোর্ট টাইপ করা আছে আমাদের কাছে, আপনি পাবেন এককপি।'

'আপনারও কি এই মত, স্যার?' সোজাসুজি চাইল রানা রাহাত খানের চোখের দিকে। 'আপনিও কি বিশ্বাস করেন এ-সব কাজ আমার দ্বারা সম্ভব?'

'আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কিছুই এসে যায় না, রানা,' দাঁতের ফাঁক থেকে পাইপটা হাতে নিয়ে বললেন রাহাত খান। 'স্পষ্ট প্রমাণ আছে তোমার বিরুদ্ধে, পুরো এক ঘণ্টার একটা ফিল্ম আছে, গোটা পঞ্চাশেক স্টিল ফটোগ্রাফ আছে...'

'গোড়া থেকে বুঝিয়ে বলুন, স্যার।' আকাশ ভেঙে পড়ল রানার মাথার ওপর। মেজর জেনারেল রাহাত খানের মুখে এই কথা শুনবে, কল্পনাতেও ছিল না ওর।

'আমিই বলছি,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'ব্যাপারটা শুরু হয়েছে দু'মাস আগে জেনেভায়। মাতাল অবস্থায় হোটেলে ফিরছিলেন আপনি অনেক রাতে। আপনাকে ঘরে পৌঁছে দেয় ভারতের একজন প্রতিভাবান সিক্রেট এজেন্ট সুহর্ষ নাগ। এবং একজন পরমাসুন্দরী ভারতীয় মহিলা এজেন্টকে ঢুকিয়ে দেয় আপনার ঘরে। বাকি ব্যাপারটা বুঝতেই পারছেন। ছবি তোলার বন্দোবস্তটাও সে-ই করেছিল। আমাদের কষ্ট করতে হয়নি। তিনদিন পরে মেয়েটির লাস পাওয়া গিয়েছিল হোটেলের সুইমিং পুলে। আপনি প্রকৃতিস্থ হয়েই বুঝতে পেরেছিলেন কি ভুল করে ফেলেছেন- তাই এইভাবে মুক্তি

পেতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু জড়িয়ে পড়লেন আরও। সুহর্ষ নাগ সময় মত সাহায্য না করলে খুনের দায়ে জেল খাটতে হত আপনাকে।'

'আচ্ছা! তাহলে খুনও করেছি?' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল রানা কথা কয়টা।

'কেবল তাই নয়, নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে বিক্রি করে দিয়েছেন সুহর্ষের কাছে। অবশ্য আপনি ওর হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্যে চেষ্টার ত্রুটি করেননি, কিন্তু এতগুলো ছবি এবং জ্বলন্ত প্রমাণ সুহর্ষের হাতে থাকায় তেমন কোন সুবিধা করে উঠতে পারেননি। অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হতে হয়েছে আপনাকে সুহর্ষের প্রস্তাবে। এবং তারপর থেকে আপনি ডাবল এজেন্টের কাজ করে চলেছেন- বিনিময়ে পয়সাও পাচ্ছেন প্রচুর। বিভিন্ন দেশের পাকিস্তানী হাই কমিশনারের অফিস থেকেও আপনি অনেকগুলো ডকুমেন্টের ফটোগ্রাফ তুলে পাচার করেছেন ইণ্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের কাছে। ঢাকায় ফিরেও পূর্ণোদ্যমে কাজ করে যাচ্ছিলেন, এমন সময় আপনাকে টোকিও হয়ে বেইজিং যাওয়ার প্রস্তাব দেয়া হলো, আমাদের অনুরোধে। যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও যাচ্ছেন, এমনি ভাব করে ভেতর ভেতর আহ্লাদে আটখানা হয়ে চলে গেলেন আপনি বেইজিং আপনার নতুন প্রভুদের নির্দেশে কিছু তথ্য জোগাড় করতে। কি, মনে পড়েছে এখন সব কথা?'

কোনও উত্তর দিল না রানা।

'আরও বলব? আপনার অজান্তে ঢাকার পি.সি.আই. হেড কোয়ার্টারে ঢুকেছেন আপনি মাইক্রো ট্র্যান্সমিটার সঙ্গে নিয়ে, ফলে অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেছে চীন ও পাকিস্তানের। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গার অন্তত একশো জন সিক্রেট এজেন্টকে কায়দা মত বাগে এনে ফেলবে ওরা অল্পদিনের মধ্যেই, ওদের ডাবল্ এজেন্ট হিসেবে কাজ করতে বাধ্য করবে। আরও শুনবেন?' এতক্ষণ একটানা কথা বলে লম্বা করে দম নিলেন অ্যাডমিরাল।

'বলুন, বলুন। থামলেন কেন? আর কি কি করেছি শুনি,' বলল রানা তিক্ত কণ্ঠে।

এবার কথা বললেন মেজর জেনারেল রাহাত খান। পাইপটা ধরিয়ে নিয়েছেন তিনি ইতিমধ্যে।

'এ ব্যাপারে আর বিশেষ কিছু বলার নেই তোমাকে। সীলমোহর করা চিঠি দেয়া হয়েছিল নিজহাতে বেইজিং পৌঁছে দেবার জন্যে, সেটা ওদের না দিয়ে আজ তুমি পোস্ট করেছ নয়াদিল্লীর ঠিকানায়। এরপরেও তোমাকে মুক্ত রাখা যুক্তিযুক্ত মনে না করায় ধরে নিয়ে আসা হয়েছে এখানে। আমি আজই সকালে চলে এসেছি জরুরী খবর পেয়ে।'

'আচ্ছা। এবার আমার কপালে কি ঘটতে চলেছে? ফাঁসি না যাবজ্জীবন কারাদণ্ড?' জিজ্ঞেস করল রানা শান্ত কণ্ঠে।

'প্রথমে তোমাকে আচ্ছা করে ইণ্টারোগেট করা হবে, মারধোর করা হবে

অল্পবিস্তর, তারপর একটা প্লেনে করে পাঠিয়ে দেয়া হবে পাকিস্তানে কোর্ট মার্শালের জন্যে। পথে দু'জন গার্ড এবং একজন পাইলটকে হত্যা করে তুমি প্লেনটাকে ক্র্যাশ ল্যাণ্ড করাবে ভারতীয় এলাকায়।'

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল রানা মেজর জেনারেল রাহাত খানের তীক্ষ্ণ দুই চোখের দিকে। দশ সেকেণ্ড একটি কথাও বেরোল না ওর মুখ থেকে। রাহাত খানের ঠোঁটের কোণে পাতলা একফালি রহস্যময় হাসি।

'কিন্তু...কিন্তু...' থেমে গেল রানা। আবার কথা বললেন রাহাত খান।

'ব্যাপারটার গুরুত্ব নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। ভয়ঙ্কর একটা ঝুঁকি নিতে হবে তোমাকে। ইচ্ছে করলে এখনও এড়িয়ে যেতে পারো। ভেবে দেখো ভাল করে।'

ধীরে ধীরে অনাবিল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল রানার মুখ। বুকের ওপর চাপানো দশ মণী পাথরটা কেউ তুলে নিয়েছে যেন। চট্ করে চোখ ফিরিয়ে দেখল অ্যাডমিরালের মুখেও হাসি। রানাকে এড়িয়ে চোখ টিপে ইশারা করতে গিয়েছিলেন তিনি রাহাত খানকে, ধরা পড়ে গেলেন।

'কিন্তু, স্যার, মাসুদ রানা হিসাবে এতদিন কাউকে দিয়ে যদি অভিনয় করিয়ে থাকেন, আমার চেহারা দেখলেই বুঝে ফেলবে ওরা।'

'না। সে সম্ভাবনা নেই। সুহর্ষ নাগ আমাদের লোক। আর তোমার নামে যে লোকটাকে এতদিন চালিয়েছি সে দেখতে অনেকটা তোমারই মত। চুলগুলো পর্যন্ত তোমার মত করে ছাঁটিয়ে নেয়া হয়েছিল। আর সিনেমা রীলটা তোলা হয়েছিল আমাদের ফটোগ্রাফিক ল্যাবরেটরিতে সেট তৈরি করে নিয়ে। বেশিরভাগ সময়ই লোকটার মুখ আবছা রাখা হয়েছে- যখন স্পষ্ট করে দেখানো হয়েছে তখন সেটা তোমার ছবি।'

'ঢাকায় যে ভারতীয় এজেন্ট মাসুদ রানাকে কণ্ট্যাক্ট করেছিল, সে তো নকল মাসুদ রানাকে স্পষ্ট দেখেছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'দেখেছে। কিন্তু সাক্ষ্য দিতে আসবে না সে আর কোনদিন। সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে তার,' গম্ভীর মুখে বললেন রাহাত খান।

ভুরু কুঁচকে গেল রানার। খুন-খারাপি পছন্দ করেন না মেজর জেনারেল। কতখানি সিরিয়াস ব্যাপার হলে এতসব আয়োজন দরকার হতে পারে, উপলব্ধি করল রানা। বুঝল ওর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অ্যাসাইনমেণ্ট এসে উপস্থিত হয়েছে আজ সামনে। চীন-পাকিস্তানের যৌথ কোনও ব্যাপার। ভয়ঙ্কর কোন কাজের কথা পাড়বে এক্ষুণি বুড়ো। ছলকে উঠল এক ঝলক রক্ত ওর বুকের ভিতর।

'তা, অন্য কাউকে দিয়ে অভিনয় না করিয়ে গোড়াতেই আমাকে বলেননি কেন, স্যার? অনর্থক...'

'অনর্থক আমি কোন কাজ করি না, রানা।' চাবুক পড়ল যেন রানার

পিঠে।

'সরি, স্যার, আমি ঠিক তা বলতে চাইনি...'

'বুঝেছি। তোমাকে প্রথমেই আনা হয়নি এই জন্যে যে, প্রথমেই যদি হঠাৎ কোন সড়ক দুর্ঘটনায় তোমার মৃত্যু হয় তাহলে আমাদের সমস্ত প্ল্যান ভেস্তে যাবে। তোমাকে দূরে সরিয়ে রেখে আগে অন্য লোককে দিয়ে তাই পথ পরিষ্কার করেছি। তুমি এই প্ল্যানের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ।'

'খুবই সাদঘাতিক ব্যাপার মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ।' এতক্ষণে কথা বললেন অ্যাডমিরাল। 'আপনি যদি সফল হতে না পারেন তাহলে আগামী ছয় মাসে পৃথিবীর চেহারা পাল্টে যাবে। সিক্রেট সার্ভিসের ইতিহাসে এক মহা বিপ্লব ঘটতে চলেছে, মেজর রানা। আপনি যদি ঠেকাতে না পারেন তাহলে আমাদের একটা তথ্যও ওদের কাছে অজানা থাকবে না। আমাদের অস্ত্র তৈরির আগেই তার ফর্মুলা মুখস্থ হয়ে যাবে ওদের। আমাদের সরকার কি প্ল্যান করতে যাচ্ছে, জেনে ফেলবে ওরা বৈঠকে আলোচনা হবার আগেই। এমন কি আমাদের রাষ্ট্রীয় নেতারা কি চিন্ত া করছে তাও অজানা থাকবে না ওদের কাছে। ছয় মাসের মধ্যেই সারা বিশ্বকে হাতের মুঠোয় নিয়ে আসবে ইণ্ডিয়া। যে কোন রাষ্ট্র যত শক্তিশালীই হোক, মাথা নোয়াতে বাধ্য হবে ভারতের কাছে। কল্পনা করতে পারেন কি ভয়ঙ্কর অবস্থা সেটা?'

রানা কিছুতেই ভেবে পেল না কি করে তা সম্ভব। কি এমন ব্যাপার ঘটাচ্ছে ভারত যাতে মহাচীন পর্যন্ত কেঁপে উঠেছে?

স্পাগলামি মনে হচ্ছে আপনার কাছে, তাই না?' সিগারেট ধরালেন অ্যাডমিরাল। 'আসলে ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল পাগলামি থেকেই। গোড়া থেকে শুনুন।' গদি আঁটা চেয়ারে একটু নড়ে চড়ে বসে আরম্ভ করলেন তিনি। 'লোকটার নাম সাদেক খান। জন্ম ঢাকা জেলায়। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিল। কিন্তু বি.এ. পরীক্ষার পরই মাথা খারাপ হয়ে যায়। মাঝে মাঝে একটু ভাল থাকে- বছর খানেক চাকরি করে এ-অফিস ও-অফিসে, অদ্ভুত ধূর্ততার সাথে প্রচুর পয়সা উপার্জন করে, তারপর আবার মাস ছ'য়েক কাটায় পাবনার মেণ্টাল হসপিটালে। কেবল মাথা খারাপ হলে হত, ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাসে একটা গাড়ির তলায় চাপা পড়ে মাথায় চোট পেয়েছিল লোকটা, দৃষ্টিশক্তিটা বাঁচাবার জন্যে মাথার মধ্যে সূক্ষ্ম একটা অপারেশন করতে হয়েছিল- সেই থেকে অদ্ভুত এক ধরনের বিকৃতি দেখা দিয়েছে ওর মধ্যে। এখানে-সেখানে যুবতী নারীর মৃতদেহ পাওয়া যেতে আরম্ভ করল পঁয়ষট্টি সালের গোড়া থেকে। অষ্টম খুনের পরই ধরা পড়ল লোকটা। বিচারে কিন্তু পাগল সাব্যস্ত হলো। মেণ্টাল হস্পিটালের সেলে পুরে দেয়া হলো ওকে।'

চুপচাপ সিগারেট টানলেন অ্যাডমিরাল কিছুক্ষণ।

'গত বছর জুলাই মাসে বন্দী স্পাই বিনিময় হলো ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে। হঠাৎ সাদেক খানকে চেয়ে বসল ভারত সরকার দুইজন মূল্যবান পাকিস্তানী এজেন্টের বিনিময়ে। এক কথায় রাজি হয়ে গেল পাকিস্তান...'

'ঠিক এক কথায় নয়,' বাধা দিলেন রাহাত খান। 'আমরা সাদেক খান সম্পর্কে সব রকম খোঁজ-খবর নিলাম। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তাকে ভারতীয় এজেন্ট হিসাবে দাঁড় করানো গেল না। হাসপাতালে খবর নিয়ে জানা গেল প্যারানোইয়ার প্রথম স্টেজ চলছে ওর। ওর ধারণা প্রত্যেকটা লোক ওকে হত্যা করবার সুযোগ খুঁজছে। তার ওপর আরেক উপসর্গ- মঙ্গলগ্রহের লোকদের সঙ্গে নাকি টেলিপ্যাথির সাহায্যে কথা বলছে সে অনর্গল। আমরা বুঝলাম- যদি অতীতে ভারতের হয়ে কোন কাজ করেও থাকে, এখন লোকটা বদ্ধ পাগল। কাজেই রাজি হয়ে গেলাম।

'ব্যাপারটা ওখানেই শেষ হয়ে যেত, কিন্তু মাস দু'য়েক পর হঠাৎ পাওয়া গেল সাদেক খানের ডায়েরীটা। লুকিয়ে রেখেছিল সে ওটা ভেন্টিলেটার গ্রিলের ওপর- হোয়াইট ওয়াশ করতে গিয়ে মিস্তিরীর চোখে পড়েছিল ওটা। হয়তো ওর মধ্যে কোন তথ্য থাকতে পারে মনে করে নার্স সে ডায়েরীটা দিয়েছিল সাদেক খান যে সাইকিয়াট্রিস্টের পেশেন্ট ছিল তাকে। তার ডেস্কে পড়েছিল ওটা হপ্তা খানেক, তারপর হঠাৎ একদিন পাতা উল্টেই অবাক হয়ে গিয়েছিল ডক্টর নিয়াজ। এতই আশ্চর্য কয়েকটা কথা লেখা ছিল ওতে যে, সেই দিনই সে ডায়েরীটা তুলে দেয় পুলিসের হাতে। সেখান থেকে সোজা চলে আসে আমাদের কাছে- কারণ আমরাই ডিল করছিলাম সাদেক খানের কেস।'

পাইপটা টেবিল থেকে তুলে নিয়ে আবার ধরাবেন কিনা ভাবলেন রাহাত খান, তারপর নামিয়ে রাখলেন সেটা টেবিলের ওপর।

'প্রত্যেকটা লোককে সন্দেহের চোখে দেখতে আরম্ভ করেছিল সাদেক খান। ডাক্তারদের ওপরই সন্দেহ ছিল ওর সবচেয়ে বেশি। এইসব অনুভূতির কথা লেখা আছে ডায়েরীতে। আশ্চর্যের কথা এই যে, প্রত্যেকটা ডাক্তার এবং নার্সের নিজেদের মধ্যেকার টুকরো টুকরো আলাপ-আলোচনা হুবহু লেখা আছে ডায়েরীতে। এমন কি জটিল সব কেস হিস্ট্রি পর্যন্ত হুবহু টোকা আছে। সবচেয়ে অবাক কাণ্ড ডক্টর নিয়াজ বলছেন উনি যে-কথা কখনও কাউকে বলেননি, মনে মনে চিন্তা করেছেন কেবল, সেইসবও হুবহু লেখা আছে।'

'প্রথম দিকে তথ্যের কিছু কিছু ভুল-ভ্রান্তি ছিল, কিন্তু মাঝামাঝি আসতেই বোঝা যায় এক অসাধারণ ক্ষমতা অর্জন করেছে সাদেক খান। এভিয়েশন টার্ম দেখে আমরা পি.আই.এ-র প্রত্যেকটি পাইলটের সাথে

যোগাযোগ করেছি। দেখা গেছে ল্যাণ্ডিং করবার সময় গ্রাউণ্ড কন্ট্রোলের সাথে তাদের কথাবার্তা লেখা আছে ডায়েরীতে। এমন কি একজন পাইলট বলল তার ব্যক্তিগত জীবনের দুই-একটা কথা চিন্তা করছিল সে সেই সময়ে- তাজ্জব কথা, হুবহু সেই চিন্তাগুলো লেখা আছে- এমন কি তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে সে যে-নামে ডাকে সে-সবও ঠিক ঠিক লিখে গেছে সাদেক খান।'

'আশ্চর্য!' বলল রানা।

'আরও অনেক কথা লেখা আছে ডায়েরীতে। সেসব তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু তার থেকে একটা কথা জানা গেছে, দূরত্ব সাদেক খানের এই টেলিপ্যাথিক কনট্যাক্টে কোন রকম বাধার সৃষ্টি করে না। আমরা খোঁজ নিয়ে দেখেছি হাজার হাজার মাইল দূরের কথাবার্তা লাইনকে লাইন লিখে গেছে সে নির্ভুলভাবে। বিস্ময়কর ব্যাপার, তাই না? যে-কোন লোকের চিন্তা ভাবনা, কথাবার্তা জানতে পারছে লোকটা। ঠিক যেন রেডিও রিসিভার।'

'সত্যিই আশ্চর্য!' বলল রানা। 'কোনমতে ওর এই ক্ষমতার কথা টের পেয়ে ভারত নিয়ে গেছে ওকে। ওকে এখন ব্যবহার করবে আমাদের বিরুদ্ধে...'

'না। তার চেয়েও বড় কিছু। সে সব কথায় পরে আসছি। বর্ডার ক্রস করবার পরই সাদেক খানকে রাজকীয় সম্মানের সঙ্গে হেলিকপ্টারে করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে দিল্লী, সেখান থেকে কোলায়ের লেকের একটা সুরক্ষিত ক্লিনিকে। দক্ষিণ ভারতের ঈস্টার্ন ঘাটে গোদাবরী আর কৃষ্ণা নদীর মাঝামাঝি এলাকায় রয়েছে বিশাল এই কোলায়ের লেক। ইলোরের কাছে। ছোট ছোট অনেকগুলো দ্বীপ আছে এই লেকের মধ্যে। একটার নাম ওঙ্কার। এই ওঙ্কার দ্বীপে সেই সুরক্ষিত ক্লিনিক।' হঠাৎ থেমে সোজাসুজি রানার চোখের দিকে চাইলেন রাহাত খান। 'কবীর চৌধুরীকে মনে আছে?'

'কবীর চৌধুরী! রাঙামাটির ডুবো-পাহাড়ের সেই পাগল বৈজ্ঞানিক?'

'হ্যাঁ। কৌশলে জেল থেকে পালিয়ে ইণ্ডিয়ায় চলে যায়। সেই কবীর চৌধুরীই এ সমস্তকিছুর উদ্যোক্তা। সে-ই আবিষ্কার করে সাদেক খানকে। এবং ভারত সরকারের মাথায় এই প্ল্যানটা ঢোকায়। এই প্রজেক্টটা পরিচালনা করছে কবীর চৌধুরী। মানুষ মরণশীল। কবীর চৌধুরী জানে হাজার চেষ্টা করলেও সাদেক খানের আয়ু বাড়াতে পারবে না সে। তাই ওর ব্রেনের অনুরূপ কম্পিউটার তৈরি করছে এখন। কাজ প্রায় সম্পূর্ণ। তৈরি হয়ে গেলে পৃথিবীর কোন তথ্য আর অজানা থাকবে না ওদের কাছে। সে এক ভয়ঙ্কর অবস্থা রানা। আর আমরা যা জানতে পেরেছি সেটা আরও ভয়ঙ্কর। যদিও ভারতের সাহায্য নিয়ে যন্ত্রটা তৈরি করছে কবীর চৌধুরী, ভারত এর ফল ভোগ করতে পারবে না। অত্যন্ত শক্তিশালী একটা ইণ্টারন্যাশনাল গ্যাঙ তৈরি করেছে কবীর চৌধুরী- যন্ত্রটা তৈরি হলেই তারা ছোবল মারবে

ভারতের বুকে। যাই হোক, আপাতত সাদেক খানকে দেশে ফিরিয়ে আনতে হবে আমাদেরকে, রানা।'

'তার মানে আমাকে যেতে হচ্ছে ওঙ্কার দ্বীপে?'

'হ্যাঁ। সমস্ত পৃথিবীর স্বার্থেই ওদের ঠেকানো দরকার। তোমার কি মনে হয়?'

'নিশ্চয়ই, স্যার। নইলে গোপন বলে কিছু থাকবে না। পৃথিবীর সমস্ত সামরিক, রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক তথ্য জানা হয়ে যাবে ওদের এবং নিজেদের ইচ্ছেমত ব্যবহার করবে ওরা ওসব তথ্যকে। সারা দুনিয়া ওদের হাতের ক্রীড়নক হয়ে পড়বে। আশ্চর্য! কিন্তু সত্যিই কি টেলিপ্যাথি দিয়ে এইসব ব্যাপার সম্ভব?'

'এ নিয়ে আমিও আলাপ-আলোচনা করেছি কয়েকজন বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞের সাথে। তাঁরা বলছেন, অত্যাধুনিক বিজ্ঞান এতদিনে স্থির নিশ্চিত হয়েছে যে, সত্যিসত্যিই এমন একটা জিনিস আছে। খুব সম্ভব ব্রেন অপারেশনের পরেই ওর এই ক্ষমতা জন্মেছে।'

'প্লেন ক্র্যাশ করবার পর আমার কাজ কি হবে, স্যার?'

'সে-সব তোমাকে পরে জানাব। আজ তুমি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে আছ। খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম নিয়ে নাও।'

এই কথায় রানার মনে পড়ল তাকে কিভাবে ধরে আনা হয়েছে। বলল, 'কিন্তু এমন ভাবে আমাকে ধরে আনার পেছনে...'

'সব প্রশ্নের উত্তর পাবে তুমি, রানা। তখন দেখবে তোমার প্রতি দুর্ব্যবহার করার পেছনে সত্যিই যৌক্তিকতা আছে।' পাইপটা আবার ধরালেন রাহাত খান। কয়েকটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন, তারপর ওটা হাতে নিয়ে বললেন, 'আর একটা কথা, ভারতীয়রা ভাল করেই জানে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দিয়েছে ওরা এবার। কাজেই গার্ডের ব্যবস্থাও সেই পরিমাণ কঠোর করা হয়েছে। কিন্তু অতিরিক্ত গার্ড দিয়ে ঘেরাও করতে পারছে না, পাছে তাই দেখে ব্যাপার কি জানতে চেষ্টা করি আমরা। ওরা জানে না যে আমরা সাদেক খানের অলৌকিক শক্তি সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হয়ে গেছি মাস তিনেক আগেই। কাজেই আমার মনে হয়, তোমার পক্ষে লোকটাকে উদ্ধার করে আনা অসম্ভব না-ও হতে পারে।'

'আপনারা যখন জানেন কোথায় ওদের গবেষণাগার, জায়গাটা ধ্বংস করে দিলেই তো চুকে যায়।'

'আরেকটা যুদ্ধের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে পারি তাহলে। সেটা চাই না আমরা।'

'বোমা ফেলা ছাড়া আরও তো উপায় আছে।'

'নেই। ভেতরে না ঢুকতে পারলে কিছু করা যাবে না। সেজন্যেই

তোমার গ্রাউণ্ড তৈরি করা হয়েছে বহু যত্নের সঙ্গে।'

'আমি এই প্ল্যানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলাম কি করে, স্যার? এত লোক থাকতে আমাকে বেছে নেয়া হলো কেন?'

'তার কারণ তুমি ক্লিনিকের ভেতর থেকে সাহায্য পাবে। ওই ক্লিনিকে এমন একজন আছে যাকে তুমি চেনো- এমন একজন, যে তোমার কাছে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ- যাকে তুমি সাহায্য করেছিলে সোয়া দুই বছর আগে।'

'কে?' ভুরু কুঁচকে স্মরণ করবার চেষ্টা করল রানা। কাকে সে সাহায্য করেছিল সোয়া দুই বছর আগে। কে তার কাছে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ হয়ে আছে।

'এই ক্লিনিকের প্রধান বৈজ্ঞানিক ডক্টর আবদুল্লাহ্ ফৈয়াজ এবং তাঁর সহকারিণী ও একমাত্র কন্যা শায়লা ফৈয়াজ।'

'শায়লা ফৈয়াজ!' চেনা চেনা লাগল নামটা রানার কাছে।

'যাকে তুমি আম্বালা হাসপাতাল থেকে উদ্ধার করে পৌঁছে দিয়েছিলে নয়াদিল্লী ওর বাবার কাছে।'

'আচ্ছা!' স্পষ্ট মনে পড়ল রানার শায়লার মুখটা।

'এবার বলো, রানা। যাবে তুমি ওঙ্কার দ্বীপে?' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন বৃদ্ধ রানার দিকে।

'যাব,' মৃদু হেসে বলল রানা।

উজ্জ্বল হয়ে উঠল মেজর জেনারেলের চোখ-মুখ।

তিন

'এই যে দেখুন আপনার পাইলট।' একটা লাসের ওপর থেকে সাদা কাপড় সরিয়ে দেখাল রানাকে মেজর টিং ফং। 'আর এ'দুটো হচ্ছে আপনার গার্ড। দেখবেন?'

'দরকার নেই। আপনি যখন বলছেন, তখন নিশ্চয়ই আছে।'

'বেশ তাহলে চলুন খাওয়া-দাওয়াটা সেরে নিই।' বেরিয়ে এল ওরা ঠাণ্ডা ঘরটা থেকে। ডাইনিং রূমের দিকে চলতে চলতে টিং ফং বলল, 'এদের ইউনিফরম পরিয়ে প্লেনের মধ্যে জায়গা মত বসিয়ে দেয়া হবে ততক্ষণে। হাতে আর বেশি সময় নেই।'

'প্লেনের মধ্যে যে বোমাটা ফাটাব, তাতে মড়াগুলো পুড়বে তো ঠিকমত?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'ধরা পড়ে যাব না তো আবার?'

'না। অবশ্য ফরেন্সিক টেস্ট করলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু

আসলে ওরা অতসব টেস্টের মধ্যে যাবেই না। আপনার গল্প অবিশ্বাস করবার কোনও কারণই নেই ওদের। আপনাকে যে ধরা হয়েছে এবং পাকিস্তানে পাঠানো হচ্ছে কোর্ট মার্শালের জন্যে, এ খবরটা কৌশলে জানানো হয়েছে ওদেরকে। ওরা বুঝবে আপনি গার্ডগুলোকে কাবু করে পাইলটকে আক্রমণ করে বসেছিলেন, ফলে ক্র্যাশ করেছে প্লেনটা, আপনি কপাল জোরে বেঁচে গেছেন, আর সবকিছু ভস্ম হয়ে গেছে।'

খেতে খেতে প্রশ্ন করল টিং ফং গতরাতে ফাইল পড়ে সব কথা রানা মনে রাখতে পেরেছে কিনা পরীক্ষা করবার জন্যে।

'সুহর্ষ নাগ দেখতে কেমন?'

'কালো-মোটা-বেঁটে-কানা,' জবাব দিল রানা। 'বাম গালে আঁচিল আছে।'

'পিকিং সামরিক ঘাঁটির ছবি তোলার জন্যে আপনাকে কী ক্যামেরা দেয়া হয়েছিল ভারতীয় এজেন্ট মারফত?'

'এম থ্রি লাইকা, সেইসাথে একটা এম সি এক্সপোজার মিটার, কে টু ফিল্টার এবং একটা ফ্ল্যাশ গান।'

'টোকিয়োতে গত মাসে যে মাইক্রো ফিল্ম ওদের এজেন্টের হাতে তুলে দিয়েছিলেন তাতে কি ছিল?'

'একশোটা পাকিস্তানী এবং চীনা এজেন্টের নাম, ঠিকানা, চেহারার বর্ণনা। এবং ঢাকার ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের কয়েকটা গোপন নক্সা।'

'চমৎকার। এবার বলুন দেখি, কিভাবে হত্যা করেছিলেন আপনি ভারতীয় মহিলা এজেন্টকে জেনেভায়? মেয়েটির হাতে কি ঘড়ি ছিল?'

'জিলেট ব্লেড দিয়ে এক পোচে গলার অর্ধেকটা নামিয়ে দিয়েছিলাম। হাতে ছিল রোলেক্স কোম্পানীর একটা গোল ঘড়ি- নাম জেনেক্স।'

'এইবার আপনাকে একটু কষ্ট দেব।' খাওয়া শেষ হতেই উঠে দাঁড়াল মেজর টিং ফং। 'যেহেতু আপনি ধরা পড়েছেন আমাদের হাতে, তাই ওরা স্বভাবতই আশা করবে খুব মনোরম ভাবে কাটেনি আপনার সময়। অল্প বিস্তর নির্যাতনের চিহ্ন থাকা দরকার আপনার শরীরে, বুঝতে পারছেন? রুটিন ওয়ার্ক।'

স্পারছি। এখানেই করবেন, না অন্য কোথাও?'

'এখানেই। চেয়ার টেবিল থেকে একটু সরে আসুন। অনর্থক ওগুলো ভাঙার কোন মানে হয় না।'

শার্ট খুলে ফেলল রানা। হাতে একটা রুমাল জড়িয়ে নিল টিং ফং। তারপর দমাদম মেরে চলল রানাকে আর্টিস্টিক কায়দায়। বুকে পিঠে গলায় গালে চোয়ালে উরুতে চাপ চাপ রক্ত জমে গেল আধ মিনিটের মধ্যেই। সবশেষে হালকা একটা ঘুসি মারল সে রানার বাম চোখ লক্ষ্য করে। আধঘণ্টার মধ্যে কালশিরে পড়ে অর্ধেক বুজে যাবে চোখটা।

'ব্যস, এতেই হবে,' সন্তুষ্টচিত্তে বলল টিং ফং। 'দেখে মনে হচ্ছে তিন ঘণ্টা নির্যাতন করা হয়েছে আপনাকে। আসুন, এবার শার্টটা গায়ে দিয়ে নিন।'

প্রচণ্ড মারের চোটে মাথা ঘুরছে রানার। টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। কাপড় পরতে সাহায্য করল ওকে টিং ফং। তারপর দুটো ব্রেসলেটের মত ধাতুর জিনিস কব্জিতে পরিয়ে স্ক্রু এঁটে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ক্ষতচিহ্ন সৃষ্টি করল দুই হাতে। দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা সহ্য করল রানা।

এবার হাসিমুখে সোজা হয়ে দাঁড়াল টিং ফং রানার সামনে। বলল, 'আপনার দেহের ওপর এই নির্যাতন করতে হলো বলে আমি দুঃখিত। মারবেন আমাকে? আমাকে পাল্টা দু'এক ঘা দিতে পারলে হয়তো আপনার ক্ষোভ কিছু কমতে পারে।'

'না, না। কি যে বলেন। আপনার ওপর আমার ক্ষোভ হবে কেন? আপনার ডিউটি আপনি করেছেন,' বলল রানা মৃদু হেসে।

'ধন্যবাদ। আপনি ঠিক বুঝতে...' ছিটকে পড়ে গেল টিং ফং মাটিতে চোয়ালের উপর রানার হাতের প্রচণ্ড এক ঘুসি খেয়ে।

উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল রানা টিং ফং-কে। বলল, 'হঠাৎ মনে পড়ল যে ওরা আশা করবে প্লেনের মধ্যে রীতিমত মারামারি করতে হয়েছে আমাকে। কাজেই একটা ঘুসি মারার চিহ্ন অন্তত আমার হাতে থাকা দরকার।'

'শোধবোধ,' বলল টিং ফং চেষ্টাকৃত হাসি ঠোঁটে টেনে। চোয়াল ডলছে।

পুরানো মডেলের একটা ফোর সিটার সিঙ্গল্-এঞ্জিন এয়ারক্রাফট। পড়ন্ত রোদে লম্বা ছায়া ফেলেছে ঘাসের ওপর। পিছনের সীটে চীনা সামরিক ইউনিফরম পরে বসে আছে দুটো মড়া, কোমরের বেল্টে রিভলভার, কোলের ওপর স্টেনগান রাখা। তৃতীয় জন হেলমেট মাথায় বসে আছে পাইলটের পাশের সীটে।

বাহ্, চমৎকার সহযাত্রী নিয়ে চলেছে এবার রানা! মৃদু হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে।

'এরা সব মারা গেছে কিসে?' জিজ্ঞেস করল সে সীট বেল্ট বাঁধতে বাঁধতে।

'একজন মরেছে হার্টফেল করে, একজন করেছে সুইসাইড, আরেকজন খুব সম্ভব লাং ক্যান্সারের রোগী ছিল,' বলল মেজর টিং ফং।

'সহযাত্রীদের পরিচয় জেনে রাখা ভাল। যাক্, চলি,' হাত বাড়াল রানা। 'অনেক কষ্ট দিয়েছি আপনাদের, বেঁচে থাকলে দেখা হবে আবার।'

'আসুন।' হ্যাণ্ডশেক করে দরজা বন্ধ করে দিল টিং ফং।

এঞ্জিনটা খানিকক্ষণ স্টার্ট দিয়ে রেখে গরম করে নিল রানা। সেই ফাঁকে কক্‌পিট চেক করে নিল। স্টিক টু দা লেফট, লেফট এলেরন আপ, অ্যাণ্ড রাইট ওয়ান ডাউন। স্টিক টু দা রাইট, রাইট এলেরন আপ, লেফট ডাউন। স্টিক ব্যাক, এলিভেটার্স আপ। স্টিক ফরওয়ার্ড, এলিভেটার্স ডাউন। রাডার রাইট, রাডার লেফট্। সুইচেস অন। ফুয়েল সিস্টেম চেক। ইসট্রুমেণ্ট চেক। দেন রেডিও।' মুখস্থ করা গত বাঁধা নিয়মে চেক করে চলল রানা।

অয়েল প্রেশার আপ। লো স্পীডে ম্যাগনেটো চেক করল রানা। তারপর স্টিকটা পিছনে রেখে থ্রটল খুলে দিল। ফুল থ্রটলে রেভ কাউণ্টার চেক করল। হাই স্পীডে আরেকবার ম্যাগনেটো চেক করে থ্রটল বন্ধ করল। এইবার ব্রেক ছেড়ে দিয়ে ধীরে ধীরে এগোল সে সামনের দিকে।

থ্রটল ওপেন করে আস্তে স্টিক ফরওয়ার্ড করল রানা। বেশ খানিকটা দৌড়ে গিয়েই মাটি ছেড়ে উঠে গেল উড়োজাহাজ শূন্যে। ক্রমে গাছপালাগুলো ছোট হয়ে এল। আরও খানিকটা উপরে উঠে সোজা পশ্চিমে এগোল সে। সাড়ে তিনশো মাইল। পুরো আড়াই ঘণ্টার পথ। গত দু'দিনের ঘটনাগুলো মনে মনে উল্টে-পাল্টেই সময় কাটানো স্থির করল রানা। সহযাত্রীদের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল একবার। মাথাগুলো সামনের দিকে ঝুলে পড়েছে, বসে আছে তারা আড়ষ্ট ভঙ্গিতে। মৃদু হাসল রানা। তারপর ডুবে গেল গভীর চিন্তায়।

ইস্ফল কোন গোলমাল করল না। কয়েকবার ব্লিপ ব্লিপ রাডার সিগন্যাল পাওয়া গেল দুর্বল ভাবে। রানা আশা করেছিল এয়ার ফোর্সের জেট আসবে তেড়ে। কিন্তু এল না। আসাম ডিঙিয়ে পাকিস্তানে ঢুকল রানা আবার। চিটাগাংকে কল সাইন দিতেই চুপ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। এবার সাবধানে এগোল রানা। কোর্স চেক করল। আগরতলার মনোযোগ আকর্ষণের জন্যে উঠে গেল অনেক ওপরে। কুমিল্লা পেরিয়েই পাগলামি আরম্ভ করল প্লেনটা।

নাকটা একটু দাবিয়ে কাৎ হয়ে ফুলস্পীডে নিচে নামতে নামতে বর্ডার ক্রস করল রানা। চষা খেত আর গাছপালা দ্রুতবেগে এগিয়ে আসতে থাকল রানার দিকে। পঞ্চাশ গজ থাকতেই সোজা হয়ে গেল প্লেনটা, তারপর আবার উঠতে আরম্ভ করল আগরতলার দিকে এগোতে এগোতে। একরাশ প্রশ্ন এসে পৌঁছল এয়ারফোনের মাধ্যমে। মৃদু হেসে সুইচ অফ করে দিল রানা। সোনামুরা, বিশালগড়, টাকারজালা পেরিয়ে এল প্লেনটা। উল্টে-পাল্টে, কাৎ হয়ে, সোজা হয়ে ডাইনে বাঁয়ে ওপরে নিচে এমন ভাবে চালাল প্লেন যে মনে হচ্ছে ভয়ঙ্কর এক জীবন-মরণ যুদ্ধ চলেছে প্লেনের ভিতর।

হঠাৎ চমকে উঠল রানা। দুটো মিগ টোয়েন্‌টি ওয়ান উঠে এসেছে আগরতলা এয়ারপোর্ট থেকে এই প্লেন থেকে তাদের প্রশ্নের কোন উত্তর না

পেয়ে। থ্রটল্ বন্ধ করে ফুল লেফট রাডার দিল রানা- সেই সঙ্গে পিছনে ধরে রাখল স্টিক। পাক খেতে আরম্ভ করল উড়োজাহাজ। এবার ফুল রাইট রাডার দিয়ে ধীরে ধীরে সামনে বাড়াল স্টিকটা। অনেকখানি নেমে এসেছিল প্লেনটা এবার আবার ওপরে উঠতে আরম্ভ করল বিচিত্র আঁকাবাঁকা ভঙ্গিতে। যেন মারামারি চলছে এখনও।

পিছন ফিরে দেখল রানা মিগ দুটো তেমনি আসছে পিছন থেকে। ক্র্যাশ এরিয়ায় পৌঁছে গেছে রানা। গঙ্গাসর আর আগরতলার মাঝামাঝি জায়গায় বর্ডারের কাছে ঘটাতে হবে অ্যাকসিডেণ্ট। গার্ডদের ব্যারাকের কাছে। ডাইভ দিল রানা। পাওয়ার কেটে দিয়ে স্টলিং স্পীডে নিয়ে এল প্লেনটা। আবছা অন্ধকার হয়ে এসেছে, রানার হাত ঘড়িতে বাজছে সাড়ে ছয়টা। এই অবস্থায় ক্র্যাশ ল্যাণ্ড করা সহজ কথা নয়।

ব্যারাক ছেড়ে হুড়মুড় করে বেরিয়ে পড়ল কয়েকজন সীমান্ত রক্ষী- দু'জনের হাতে রাইফেল। চীনা প্লেন দেখে বিনা দ্বিধায় গুলি করল ওরা। কেবিন স্ক্রীন চুর হয়ে গেল। বাতাসের বেগে কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছে না রানা আর। ঠাস করে চড় পড়ল ওর গালে। না তাকিয়েও বুঝতে পারল রানা, ক্যান্সার রোগীর চড়। ঝাঁকাঝাঁকিতে আল্গা হয়ে ঝুলছে ওর হাতটা কিছুক্ষণ থেকে। ক্র্যাশ-ল্যাণ্ড আর করতে হলো না, ব্যারাকের একটা থামের সাথে পাখাটা ধাক্কা খেয়ে পঞ্চাশ গজের মধ্যে আপনা-আপনি ল্যাণ্ডিং হয়ে গেল। ধাক্কার চোটে প্লেনের বডি দুমড়ে গিয়ে দরজা খুলে গেল ঝটাং করে।

পরমুহূর্তে ছিটকে দশহাত দূরে গিয়ে পড়ল রানা প্লেন থেকে বেরিয়ে। ডান পায়ে তীব্র একটা ব্যথা অনুভব করল, তারপর চষা খেতের উপরে কয়েকটা ডিগবাজি খেয়ে একটা ডোবার নরম কাদায় পড়ল সে মুখ থুবড়ে। লোকজনের চিৎকার আর সাইরেনের শব্দ শুনতে পেল সে।

উঠে বসবার চেষ্টা করল রানা। সারা গায়ে অসহ্য ব্যথা, কয়েক জায়গায় কেটে গিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। চারদিকে চেয়েই চম্কে উঠল সে। সাইরেন দিতে দিতে এগিয়ে আসছে দুটো পুলিসের গাড়ি, সীমান্ত রক্ষীরাও এগিয়ে আসছে প্লেনের ধ্বংসাবশেষের দিকে। এক্ষুণি প্লেনের কাছে যাওয়া দরকার। কেবিনটা আস্ত রয়েছে। কোনও মতে ওদের আগে ওখানে পৌঁছে ডিটোনেটর লিভারটা না টানতে পারলে সব আয়োজন শেষ হয়ে যাবে।

উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল রানা। কিন্তু পারল না। ডান পা-টা মাটিতে ছোঁয়ানো যাচ্ছে না। হয় ভেঙে গেছে, নয়তো ভীষণভাবে মচকেছে কব্জিটা। তাড়াহুড়োর মধ্যে চিন্তা করবার চেষ্টা করল রানা, মূল প্ল্যানটা ঠিক রেখে অন্যরকম কোন গল্প বানিয়ে বলা সম্ভব কিনা। কিছুই এল না মাথায়। মাথা খারাপ হয়ে গেল ওর। যে করেই হোক প্লেনের কাছে পৌঁছতে হবে ওকে।

হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে আরম্ভ করল রানা। দ্রুত এগিয়ে আসছে

গার্ডগুলো। পঁচিশ গজ দূরে একটা কাঁটাতারের বেড়া টপকাচ্ছে ওরা এখন। পাগলের মত মাটি খামচে ধরে বাম পায়ের ধাক্কায় এগোল রানা।

শেষের কয়েক হাত দাঁতে দাঁত চেপে উঠে দাঁড়িয়ে এক পায়ে লাফিয়ে চলল রানা। পড়ে গেল এবড়োখেবড়ো চষা খেতের ওপর টাল সামলাতে না পেরে। আবার এগোল হামাগুড়ি দিয়ে। কোনও মতে আছড়ে-পাছড়ে আবার উঠে দাঁড়াল সে। কেবিনের খোলা দরজা দিয়ে চেয়ে দেখল সোজা ওর চোখের দিকে চেয়ে আছে হার্টফেলের মড়াটা। ড্রাইভিং সীটের নিচেই লিভার- হাত বাড়িয়ে টেনে দিল সে ওটাকে।

শক্তিশালী দু'জন গার্ড পিছন থেকে ধরল রানার দুই হাত।

স্পালাও!' চিৎকার করে উঠল রানা। 'এক্ষুণি বার্স্ট করবে। আগুন ধরে গেছে পেট্রলে!'

টেনে নিয়ে গেল ওরা রানাকে নিরাপদ দূরত্বে। যারা এগোচ্ছিল তাদের নিষেধ করল আর সামনে বাড়তে। কেবিনের দরজা দিয়ে ভিতরে আগুন দেখা গেল।

'শুয়ে পড়ো! শুয়ে পড়ো সবাই!' আবার বলল রানা।

রানাকে ধরে থাকা অবস্থাতেই শুয়ে পড়ল সামনের দু'জন। দুই সেকেণ্ড পরই প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠল রানা। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন।

পরম নিশ্চিন্তে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রানা। তিনটে মৃতদেহের হাড় ক'খানা পাবে ওরা কেবল।

চার

কি হয়েছে?' পুলিস ভ্যান থেকে নেমে এল একজন অফিসার।

'এই লোকটা প্লেন নিয়ে আক্রমণ করেছিল আমাদের ব্যারাক। লছমন আর ভৌমিক গুলি করে নামিয়েছে,' জানাল একজন সীমান্তরক্ষী উত্তেজিত কণ্ঠে।

'কে তুমি? কি হয়েছিল প্লেনের?' জিজ্ঞেস করল অফিসার রানাকে।

'আমার নাম মাসুদ রানা। প্লেনের দু'জন গার্ডকে খুন করে পাইলটকে ভারতীয় এলাকায় ল্যাণ্ড করতে বাধ্য করেছি আমি।'

'কেন?' প্রশ্নটা করেই বুঝতে পারল অফিসার এখন এই লোকটাকে দিয়ে কোন কথা বলালে গুজব আরম্ভ হয়ে যেতে পারে। 'ঠিক আছে সব কথা হেড কোয়ার্টারে গিয়ে শোনা যাবে। উঠে পড়ো গাড়িতে।'

অফিসারের পাশেই বসানো হলো রানাকে। আগেই সার্চ করে দেখা

গেছে অস্ত্র নেই রানার সাথে। ছেড়ে দিল গাড়ি। অল্প কিছুদূর গিয়ে রাস্তার বামে থেমে দাঁড়াল কয়েক সেকেণ্ড- টং-টং করে ঘণ্টা দিতে দিতে দুটো দমকল লরী চলে গেল বিধ্বস্ত প্লেনটার দিকে। চলল এবার ওরা আগরতলার দিকে।

স্পাকিস্তানী?' প্রশ্ন করল অফিসার। তারপরই রানার দুইহাতের কব্জিতে ক্ষতচিহ্ন দেখতে পেল সে। 'বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তোমাকে। হাতকড়ার দাগ না ওগুলো? স্পাই?'

'হ্যাঁ। আমাকে কোর্টমার্শালের জন্যে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ঢাকায়।'

বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল অফিসার রানার মুখের দিকে। বোধহয় আন্দাজ করতে পারল কেন একজন পাকিস্তানী স্পাইকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ঢাকায় কোর্টমার্শালের জন্যে, কেন ভারতীয় এলাকায় প্লেন ল্যাণ্ড করাতে পারলে ভয়ের কিছুই নেই বলে ভাবছে একজন পাকিস্তানী স্পাই। চুপ করে রইল সে। এসব ডিফেন্সের ব্যাপারে ঘাঁটাঘাঁটি না করাই ভাল।

'আমার ডান পায়ের কব্জিটা বোধহয় ভেঙে গেছে। আগরতলা পৌঁছেই কোন ডাক্তারকে দিয়ে পরীক্ষা করানো দরকার।'

'চিন্তা করবেন না। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

পুলিস হেডকোয়ার্টার থেকে দু'তিন জায়গায় টেলিফোন করতেই যেন ভীমরুলের চাকে ঢিল পড়ল। মুহুর্মুহুঃ রানা সংক্রান্ত টেলিফোন আসতে আরম্ভ করল পুলিস হেডকোয়ার্টারের পাঁচ-পাঁচটা লাইনে। অস্থির হয়ে উঠল অফিসার। ক্রমে রানার প্রতি তার ব্যবহারটা ধমক থেকে সমীহ, শেষকালে শ্রদ্ধায় পরিণত হলো। রীতিমত খাতির-যত্ন আরম্ভ করল লোকটা রানাকে। এক কথায় যাকে বলে ভি আই পি ট্রিস্টমেণ্ট। চা, সিগারেট এমন কি শেষ পর্যন্ত পানও খাবার অনুরোধ করে বসল সে রানাকে। ইতিমধ্যে লোশন লাগিয়ে রানার মচকানো পায়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিয়েছে একজন ডাক্তার।

আধঘণ্টার মধ্যে দিল্লীর সাথে জরুরী বেতার যোগাযোগের পর চারজন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারী এসে উপস্থিত হলো ল্যাণ্ডরোভারে করে। তাদের একটা ঘরে বসিয়ে রানাকে নিয়ে যাওয়া হলো সেখানে।

'বসুন,' বলল এদের মধ্যে কর্নেল র‍্যাঙ্কের অফিসার। পুলিসের অফিসারকে বলল, 'আপনি এবার যেতে পারেন, প্রয়োজন হলে ডাকব।'

'ইয়েস, স্যার।' বেরিয়ে গেল পুলিস অফিসার।

'আপনার নাম মেজর মাসুদ রানা? পাকিস্তান কাউণ্টার ইণ্টেলিজেন্সের একজন এজেণ্ট- দেশের বাইরে কার্যরত অবস্থায় প্রয়োজন বোধে মানুষ হত্যার অনুমতি যে পেয়েছে সরকারীভাবে?'

'দু'জনকে এই ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল। আমি তাদের মধ্যে একজন,'

বলল রানা।

'কিছুদিন আগে আপনি আমাদের হয়ে কাজ করবেন বলে লিখিতভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিলেন?'

'খুব সম্ভব,' আমতা আমতা করে বলল রানা।

'খুব সম্ভব? তার মানে?'

'মানে...মানে, ঠিক মনে নেই। অ্যাক্সিডেন্টের পর কিছু কিছু কথা চেষ্টা করেও মনে আনতে পারছি না।'

'মাথায় আঘাত পেয়েছিলেন নাকি?' সচকিত কণ্ঠে বলল কর্নেল।

'এইবার মনে এসেছে। জেনেভায় একরাতে, অতিরিক্ত মদ খেয়েছিলাম, সুহর্ষ নাগ বলে একজনের সাথে পরিচয় হয়েছিল, তাকে বলেছিলাম আপনাদের হয়ে কাজ করতে রাজি আছি...'

'সেসব তো দু'মাস আগের কথা। তারপর কোন ঘটনা স্মরণ করতে পারছেন না?'

'হ্যাঁ, বিস্ফোরণ...ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম আমি দু'জনের ওপর...তারপর জোরে ধাক্কা খেল প্লেনটা যেন কিসের সঙ্গে। লোকগুলোকে বের করবারও চেষ্টা করেছিলাম আমি...'

'এ সবকিছুই জানি আমরা,' বলল কর্নেল। 'গতকাল রেঙ্গ□নে চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিসের হাতে বন্দী হয়েছিলেন আপনি। ওখান থেকে মান্দালয়ে নিয়ে আসা হয় আপনাকে কালই ইন্টারোগেশনের জন্যে। মনে পড়েছে?'

'কই না তো। মান্দালয়? আমার মনে পড়ছে রিভলভার কেড়ে নিয়ে গুলি করেছিলাম গার্ডদের। হঠাৎ ডিগবাজি খেতে আরম্ভ করল প্লেনটা...'

'ঠিক আছে। পাইলট এবং দু'জন গার্ড ঠিকই ছিল। ওরা তিনজন চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিসের লোক ছিল। ওদের ইউনিফরমের দুই-একটা ব্রাসের টুকরো পাওয়া গেছে ভস্ম স্তূপের মধ্যে। কিন্তু আমরা জানতে চাই অন্যকথা।' টেবিলের উপর কনুই রেখে একটু সামনের দিকে ঝুঁকে এল কর্নেল।

'চীন সফর শেষ হলে হংকং থেকে কাগজ-পত্র নিয়ে এসেছিলেন আপনি রেঙ্গ□নে। মনে আছে?'

'কাগজ-পত্র?' অবাক হলো রানা।

'হ্যাঁ, অত্যন্ত জরুরী কিছু কাগজ-পত্র। বইয়ের মধ্যে ছিল। হংকং-এর একটা বইয়ের দোকান থেকে বইটা কিনে রেঙ্গ□নের আরেকটা দোকানে বিক্রি করেছিলেন আপনি সেটা। পথে তথ্যগুলো মুখস্থ করেছিলেন আপনি ঢাকায় আমাদের এজেন্টকে দেবার জন্যে- অত্যন্ত জরুরী কয়েকটা তথ্য, মনে নেই?'

'কোথায়। মনে পড়ছে না-তো!' ভুরু কুঁচকে মনে আনবার চেষ্টা করল

রানা। 'খুবই কি জরুরী কিছু। মনে আসছে না তো আমার...'

'ভাল করে ভেবে দেখুন,' বলল কর্নেল।

'চেষ্টা তো করছি, মনে না এলে কি করব?' জবাব দিল রানা।

নিচু গলায় নিজেদের মধ্যে কি যেন আলোচনা করল অফিসাররা। বেল টিপতেই তটস্থ হয়ে ঢুকল ঘরে পুলিস অফিসার।

'এই ভদ্রলোকের মেডিকেল চেক-আপ করা হয়েছে?'

স্পা মচকে গিয়েছিল, ডাক্তার ডেকে ব্যাণ্ডেজ করিয়ে দিয়েছি, স্যার।'

'আর কিছু চেক করা হয়নি?'

'না, স্যার। উনি বললেন কেবল পায়ে ব্যথা পেয়েছেন তাই...'

'মানুষটা প্লেন ক্র্যাশে আহত হলো, সাথের তিনজন মারাই গেল, তবু আপনি থরো মেডিকেল চেক-আপ করাননি ওর?' বিরক্ত কণ্ঠে বলল কর্নেল। রানা বুঝল তথ্যগুলো ভারতের জন্যে নি য়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। রানার দিকে ফিরে বলল কর্নেল, 'আপনি আপনার স্মৃতিভ্রংশের কথা বলেননি ওকে?'

'না। আমি নিজেও ভাল করে টের পাইনি আগে, এখন বুঝতে পারছি।'

দিল্লীর সাথে রেডিও মারফত আলাপ করা হলো। রানার স্মৃতিভ্রংশের কথা জানানো হলো, সেখান থেকে ডিরেকশন এল। নোট করে নিয়ে আবার ঘরে প্রবেশ করল কর্নেল। টুকিটাকি কয়েকটা প্রশ্ন করে রানার উত্তরগুলো লিখে নিল সে। খুবই চিন্তিত এবং উদ্বিগ্ন মনে হলো তাকে।

'ঠিক আছে,' উঠে দাঁড়াল কর্নেল। সাথে সাথে আর সবাইও দাঁড়াল। 'কিচ্ছু ভাববেন না। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবেন আপনি। ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে। নয়াদিল্লীর সাথে কথা বলেছি, আপনার সব রকমের সুবিধার দিকে নজর রাখতে বলা হয়েছে আমাকে। আজই রাতে আপনাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে নয়াদিল্লী, ওখান থেকে আমাদের একটা স্পেশাল ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া হবে। খুব শীঘ্রিই ভাল হয়ে যাবেন।'

'অনেক ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'কোথায় সেই ক্লিনিকটা?'

'দাক্ষিণাত্যে। কোলায়ের লেকের একটা দ্বীপে। ভারতের সেরা মেণ্টাল ক্লিনিক ওটা এখন।'

যেন দাক্ষিণাত্যেই হোক আর দার্জিলিং-এই হোক রানার কিচ্ছু যায় আসে না, এমনিভাবে মাথা নাড়ল রানা। ভিতরের উচ্ছ্বাস টিপে মারল সে কঠিন হাতে- চেহারায় প্রকাশ পেল না একবিন্দুও। ঠিকই বলেছিল বুড়ো-চীনা এজেন্টের নামের লিস্টটা খুবই দরকার ভারতের। তাই সেরা ক্লিনিকে পাঠাবে এরা রানাকে। এই রকম প্ল্যান মাফিক ভালয় ভালয় বাকিটুকু সারা গেলেই হয় এখন। আসলে বাইরে থেকে সব কিছুই কঠিন মনে হয়, কাজে নেমে গেলে কেমন করে যেন সহজ হয়ে যায় সবকিছু। এ রানা বহুবার

দেখেছে। মনটা হালকা হয়ে গেল রানার।

খলখল করে হেসে উঠল লোকটা।

বিছানার উপর চিৎ হয়ে পড়ে আছে একটি রমণীদেহ। এলোমেলো কুঁচকানো বিছানার চাদর। কপালটা একখানে অসম্ভব ফুলে উঠেছে রমণীর। অসাড় দেহটা জ্ঞানহীন মনে হচ্ছে- তবে শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে।

এবার দ্বিতীয় ক্যামেরায় ধরা পড়ল একজন লোকের চেহারা। দোহারা গড়ন, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোখে অস্বাভাবিক দৃষ্টি। মুখটা হাঁ হয়ে আছে। দুই কষা বেয়ে লালা গড়াচ্ছে। লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে বিছানার দিকে।

এগোতে গিয়েও কি মনে করে ফিরে গেল লোকটা ড্রেসিং টেবিলের কাছে। ড্রয়ার টেনে কি যেন খুঁজল ব্যস্ত হাতে। কি যেন মুঠো করে ধরে এগিয়ে এল সে বিছানার পাশে। বালিশের পাশে রাখল সে জিনিসটা।

প্রথম ক্যামেরা চালু হলো আবার। বালিশের পাশে দাড়ি কামানোর খুর দেখা গেল একটা। আলোর প্রতিফলন হচ্ছে ওটার চকচকে খোলা ব্লেডে। তেমনি শুয়ে রয়েছে রমণী। জ্ঞানহীন। উঠে এসেছে লোকটা, দুলে উঠল বিছানা।

সামনের দিকে ঝুঁকে নিবিষ্টচিত্তে একশো পঞ্চান্নতম বার উপভোগ করছে দৃশ্যটা কর্নেল মিস বটব্যাল। একা। প্রশস্ত ঘরটায় প্রজেক্টারের একটা মৃদু শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। জোরে জোরে শ্বাস পড়ছে কর্নেল বটব্যালের। ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে আছে, শুকিয়ে এসেছে জিভ। ধ্বক্ ধ্বক্ করে জ্বলছে দুই চোখ। স্ক্রীনের ওপরের দৃশ্যটা গিলে খাচ্ছে যেন সে।

অদ্ভুত ধরনের একটা মুখোশ পরা কর্নেল মিস্ বটব্যালের মুখে। পাতলা রাবারের তৈরি। নাক, মুখ, চোখ সবই আছে ঠিক ঠিক জায়গায় বসানো, কিন্তু সবটা মিলে কেমন বিকট লাগে দেখতে। রুজ লিপস্টিক লাগানো আছে গালে, ঠোঁটে। মুখে সর্বক্ষণ লেগে আছে একই মাপের একটুকরো হাসি। আড়ালে হয়তো তার সম্পর্কে সমালোচনা হয়, কিন্তু এই মহিলার সামনে দাঁড়িয়ে বুক কাঁপবে না এমন বীরপুরুষ খুব কমই আছে ইণ্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিসে। অত্যন্ত ক্ষমতাশালী বদমেজাজী উচ্চপদস্থ অফিসার সে সার্ভিসের।

ঘামে পিচ্ছিল হয়ে গিয়েছে মুখোশ। চোখের গর্তটা সরে যেতে চাইছে একপাশে- ব্যস্ত হাতে টেনে ঠিক করে নিল বটব্যাল। সমস্ত মনোযোগ তার একত্রীভূত হয়েছে এখন স্ক্রীনের ওপর। এইবার!

ঠিক এমনি সময় ডেস্কের উপর একটা ওয়ার্নিং লাইট জ্বলে উঠল। পরমুহূর্তে বেল বেজে উঠল ঘরের মধ্যে। রসভঙ্গ হয়ে যাওয়ায় জিভ দিয়ে একটা বিরক্তিসূচক শব্দ করল মিস্ বটব্যাল। প্রজেক্টার অফ করে দিয়ে

ডেস্কের ওপরের একটা সুইচ টিপল সে। দেয়ালের গায়ে বসানো ক্লোজড সার্কিট টেলিভিশন স্ক্রীনে আগন্তুকের চেহারা দেখা গেল। আরেকটা সুইচ টিপতেই একটা দরজা খুলে গেল। ঘরে প্রবেশ করল সামরিক পোশাক পরা একজন লোক।

'কি খবর, ক্যাপ্টেন খান্না? বিরক্ত করবার আর সময় পেলে না?' কণ্ঠস্বরটা বিরক্ত কিন্তু মুখোশের মেকি হাসিটা লেগেই আছে ঠোঁটে, তাই অস্বাভাবিক শোনাল কথাগুলো।

মিস্ বটব্যালের মুডের সাথে গত তিনমাসে ভাল ভাবেই পরিচয় হয়ে গেছে ক্যাপ্টেন খান্নার, তাই প্রথমে কাজের কথায় এল সে।

'দিল্লী থেকে মেসেজ এসেছে। এসে গেছে মাসুদ রানা। ওকে এই ওঙ্কার দ্বীপের উদ্দেশে রওনা করে দেয়া হয়েছে প্লেনে।'

এক কথাতেই পাল্টে গেল বটব্যালের মেজাজ। খুশি হয়ে উঠল সে। বলল, 'ভারতে ঢুকল কি করে?'

'প্লেন ক্র্যাশ। আগরতলায়। পুরো রিপোর্ট পৌঁছে যাবে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে।'

'মাসুদ রানার শারীরিক কোন ক্ষতি হয়নি তো?'

'না। তবে স্মৃতিভ্রংশের ভান করবে বলেছিলেন, ঠিক তাই হয়েছে।'

'তা তো হবেই। ওরা জানে ডক্টর আবদুল্লাহ ফৈয়াজ অ্যামনেশিয়ার বিশেষজ্ঞ। কাজেই এ রকম একটা কিছু ভান করলে ওঙ্কার দ্বীপে এসে পৌঁছতে পারবে মাসুদ রানা।'

মৃদু হাসল ক্যাপ্টেন খান্না। 'এ পর্যন্ত এই ব্যাপারে আপনি যা যা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন সবগুলো মিলে গেছে কাঁটায় কাঁটায়। আ র্য...'

'অত আ র্য হবার কি আছে? তুমি কি মনে করেছিলে এক-আধটা কথা না-ও মিলতে পারে?' জিজ্ঞেস করল কর্নেল বটব্যাল কঠোর কণ্ঠে।

'না, না। তা ঠিক ভাবিনি। তবে ওদের প্রত্যেকটা প্ল্যান, প্রত্যেকটা কার্যকলাপ, প্রতিটা খুঁটিনাটি এমন নির্ভুলভাবে দু'মাস আগে বলে দিলে কে না আ র্য হবে, বলুন?'

'আমি বৈজ্ঞানিকের মত চুল চেরা বিশ্লেষণ করেছি এই ব্যাপারটা খান্না, একটা বিশেষ ব্যক্তিগত স্বার্থে। যখনই পাকিস্তান এবং চীন জানতে পেরেছে সাদেক খানের আ র্য শক্তির কথা তখনই জানি ওরা একজন এজেন্ট পাঠাবে হয় ওকে খুন করতে, নয় দেশে ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করতে। পাঠাবেই। আর যেহেতু শায়লা ফৈয়াজকে একবার বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিল মাসুদ রানা- মাসুদ রানাকে পাঠানোই স্বাভাবিক। তার পরের ব্যাপারগুলো তো ছক বাঁধা গৎ।' কথা বলতে গিয়ে মুখোশটা সরে গিয়েছিল একটু, টেনে সোজা করে বলল, 'যাক। ক্লিনিকের খবর কদ্দূর?'

'প্রফেসর সন্তোষ বলছে হপ্তাখানেকের মধ্যেই ডক্টর ফৈয়াজের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে। ব্রেন অ্যানালিসিস সম্পূর্ণ তো হয়েছেই, কম্পিউটারও তৈরি হয়ে গেছে, কয়েকটা অ্যাডজাস্টমেণ্ট কেবল বাকি। কিন্তু, কবীর চৌধুরী সাহেব না ফেরা পর্যন্ত কিছুই বলা যাচ্ছে না।'

'কবীর চৌধুরী ফিরছেন কবে?' সমীহ ফুটে উঠল মিস্ বটব্যালের কণ্ঠে।

'ঠিক নেই। আজ, কাল, পরশু- যে কোনদিন ফিরতে পারেন।'

'যাক, সন্তোষ মুখার্জী সবকিছু বুঝে নিয়েছে তো?'

'বলছে তো বুঝে নিচ্ছে।'

'বেশ। তারপর খতম করে দিতে হবে ওই শয়তান দুটোকে। দুধ-কলা দিয়ে সাপ পোষার কোন মানেই হয় না। পালিয়ে গেলে দেশের অগৌরব। দুই-দুইবারের চেষ্টা ব্যর্থ করা গেছে, তৃতীয়বার ফস্কেও যেতে পারে। কাজেই শেষ করে দিতে হবে।' হঠাৎ অস্ফুট কণ্ঠে অনেকটা আপন মনে বলল, 'সব ক'টাকে জড়িয়ে এনেছি জালে। এইবার বিষ কামড় দিতে হবে।' তারপর সচকিত হয়ে সামলে নিল সে। 'সাদেক খানের কি অবস্থা?'

'নার্সটাকে খুন করবার পর থেকে বেশির ভাগ সময় ঘুম পাড়িয়েই রাখা হচ্ছে ওকে।'

'ঠিক আছে। তুমি এখন যেতে পারো। আর দেখো, মাসুদ রানা যেন নির্বিঘ্নে ক্লিনিকে পৌঁছায়। মাঝে কেউ কোন মাতব্বরি করলে সরাসরি আমার কাছে জবাবদিহি করতে হবে তাকে।'

'আমি সব ডিপার্টমেণ্টকেই জানিয়ে দিয়েছি। টপ প্রায়োরিটি দেয়া হবে সবখানে।'

'কাল বিকেলে পৌঁছবে সে এখানে। আমি চাই পরশু সকাল পর্যন্ত যেন সে কিছুই টের না পায়। একটা রাত ও মনের আনন্দে প্ল্যান করুক- মনে করুক সবকিছু ঠিক আছে ওদের প্ল্যান মাফিক। প্রফেসর সন্তোষ ফিরলেই আমার সঙ্গে দেখা করতে বলো, ঠিক কবে সে সব কাজ হাতে তুলে নিতে পারবে আমি নিজের কানে শুনতে চাই। আর কবীর চৌধুরী যদি এর মধ্যে এসে পৌঁছান খেয়াল রাখবে যেন মাসুদ রানার ব্যাপার তাঁর কানে না যায়। বুঝেছ? এবার যাও।'

বেরিয়ে গেল ক্যাপ্টেন খান্না। সুইচ টিপতেই বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মিস্ বটব্যাল। পাশের বাথরুমে ঢুকে আয়নার সামনে দাঁড়াল সে। মুখের ঘা থেকে রস বেরিয়ে ভিজে চটচটে হয়ে গেছে রাবারের মুখোশটা। হালকা একটা দুর্গন্ধ নাকে আসছে। বেসিনে ঠাণ্ডা পানি ভরল সে। তাকের উপর থেকে একটা ক্রীমের শিশি নামাল। তারপর খুলে ফেলল মুখোশটা।

নিজের ভয়ঙ্কর চেহারার দিকে একবারও চাইল না কর্নেল বটব্যাল। মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে ছোট-বড়-মাঝারি গর্ত, ক্ষতচিহ্ন আর চাকা চাকা কালো পোড়া মাংস জমে থাকা বীভৎস মুখে ঠাণ্ডা পানি ছিটাল কিছুক্ষণ। মুখোশ খোলা অবস্থায় দেখলে মানুষের চেহারা বলে চেনা যায় না। ঠোঁটগুলো গলে গিয়ে বিচ্ছিরি আকার ধারণ করেছে মুখটা, নাকের ডানপাশটা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন, একটি পাপড়ি নেই চোখে- চোখের পাতাও গলে গেছে খানিকটা, পৈশাচিক দৃষ্টি সে চোখে।

যত্নের সঙ্গে লোশন লাগাল ক্ষতগুলোয়। আপন মনে বলল, 'ধৈর্য ধরো, ললিতা, আর একটা দিন ধৈর্য ধরো। আসছে মাসুদ রানা। এতদিন অপেক্ষা করেছ, আর একটা দিন। তোমার প্রতিহিংসা চরিতার্থ হবেই।'

দুর্গন্ধযুক্ত মুখোশটা ফেলে দিয়ে নতুন একটা মুখোশ পরে নিল কর্নেল ললিতা বটব্যাল।

পাঁচ

রানাকে হায়দ্রাবাদে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল ডাকোটা। ওখান থেকে হেলিকপ্টারে করে নিয়ে যাওয়া হবে ওকে ওঙ্কার দ্বীপে। হেলিকপ্টারের পাইলটের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল ডাকোটার এয়ার হোস্টেস।

'এখান থেকে ওঙ্কার দ্বীপে পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'দুই ঘণ্টা,' উত্তর দিল পাইলট। 'কিন্তু রওনা হতে আধঘণ্টা দেরি আছে। আসুন, খাওয়া-দাওয়া সেরে নেয়া যাক।'

এয়ারপোর্ট রেস্তোরাঁয় লাঞ্চ খেয়ে নিয়ে ওরা এসে দাঁড়াল হেলিকপ্টারের সামনে। ফোর-সীটার, টুইন রোটর ব্লেড। দরজা খুলে দিতেই উঠে বসল রানা।

'কয়েক মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। প্রফেসর সন্তোষ মুখার্জীকেও নিতে হবে ক্লিনিকে।'

'প্রফেসর সন্তোষ কে?'

'ওখানকারই লোক। গত পরশু হায়দ্রাবাদে এসেছিলেন কয়েকটা ওষুধ কিনতে। প্রায়ই যান-আসেন। ডাক্তার-ফাক্তার হবেন- জিজ্ঞেস করিনি কোনদিন।'

রানাকে হেলিকপ্টারের কন্ট্রোলগুলোর দিকে চাইতে দেখে বলল, 'আপনি পাইলট নাকি?'

'এই ধরনের হেলিকপ্টার চালাইনি কোনদিন। খুব কঠিন বুঝি?'

‘কঠিন কিছুই না, অন্যগুলোর থেকে একটু আলাদা।’

‘স্পীড কত?’

‘একশো দশ। টু-ফিফটি-ফাইভ হর্স পাওয়ার, এ১-১৪ভি পিস্টন এঞ্জিন।’

‘রেঞ্জ কি রকম?’

‘সোয়াশো মত। নালগোন্দায় নামতে হবে একবার।’

মনে মনে একবার চিন্তা করল রানা সাদেক খানকে যদি বের করতে পারে তাহলে এটা নিয়ে নরসাপুরে অপেক্ষারত সাবমেরিন পর্যন্ত পৌঁছবার সুবিধা-অসুবিধা। তারপর অন্য কথায় চলে গেল সে।

‘ক্লিনিকটা কি রকম?’

‘অত্যাধুনিক,’ বলল পাইলট। ‘একটা দ্বীপের ওপর। আমি অবশ্য ল্যাবরেটরির ভেতরে যাইনি কোনদিন। আমার কাজ হলো এটাতে করে খাবার-দাবার আর লোক পারাপার করা।’

‘দ্বীপের সবকিছু কি হায়দ্রাবাদ থেকে যায়?’

‘না। ইলোর থেকে। এখানে বিশেষ দরকার না পড়লে আসতে হয় না আমাকে। আজ এসেছি আপনার জন্যে- হঠাৎ প্রফেসর সন্তোষ খবর পাঠলেন উনিও ফিরবেন আজ ক্লিনিকে। এক ঢিলে দুই পাখি মেরে নিয়ে চলেছি। এই যে এসে গেছেন প্রফেসর।’

হেলিকপ্টার পার্কের গা ঘেঁষে দাঁড়াল এসে একটা অ্যামব্যাসাডার গাড়ি। বেঁটে খাটো, চকচকে টাক-মাথা একজন কালো ফ্রেমের চশমা পরা লোক নামল গাড়ি থেকে। গোল মুখ, গাল দুটো ফোলা। দাড়ি গোঁপ পরিষ্কার করে কামানো।

‘আপনি নি য়ই মেজর মাসুদ রানা? অ্যামনেশিয়া পেশেণ্ট?’ বলল লোকটা একটা সীটে উঠে বসে। কণ্ঠস্বরটা ফ্যাঁশফেঁশে। যেন একরাশ কফের ফাঁক-ফোকর দিয়ে বেরোচ্ছে। অস্বস্তিকর। নিজেই কেশে গলা পরিষ্কার করতে ইচ্ছে করে শ্রোতার। ‘আমার নাম সন্তোষ মুখোপাধ্যায়। ক্লিনিকের হেড সাইন্টিস্ট।’

‘আমি শুনলাম ডক্টর ফৈয়াজ বলে একজন নাকি এখানকার চীফ সাইন্টিস্ট?’ জিজ্ঞেস করল রানা নিরুৎসুক কণ্ঠে।

‘ডক্টর ফৈয়াজ?’ প্রফেসর সন্তোষের মুখে অসন্তোষ ফুটে উঠল। ‘হ্যাঁ উনি রিসার্চ নিয়ে আছেন, পেশেণ্টের ভার আমারই ওপর।’

গর্জন করে উঠল হেলিকপ্টার এঞ্জিন। দু’শো গজ উপরে উঠেই ছুটল সেটা সোজা পুব দিকে।

‘দু’দিনেই আপনার স্মৃতিশক্তি ফিরিয়ে আনব আমরা। আধুনিকতম যন্ত্রপাতি আছে এই ক্লিনিকে। স্পেশাল টেকনিকে ট্রিস্টমেণ্ট করা হয়

আমাদের এখানে।'

'শুনে স্বস্তি বোধ করছি,' বলল রানা। 'আমি একটা প্লেন দুর্ঘটনায় পড়েছিলাম। আগে-পরের সবকথা মনে আছে আমার, কিন্তু মাঝে থেকে দুটো সপ্তাহ গায়েব। এই দুই সপ্তাহের কোন কথা কিছুতেই মনে করতে পারছি না।'

'এরকম হয়। কিন্তু আপনাকে ভালমত পরীক্ষা না করে কিছুই বলতে পারছি না।' পকেট থেকে কয়েকটা কাগজ-পত্র বের করে তার মধ্যে মগ্ন হয়ে পড়ল প্রফেসর সন্তোষ মুখার্জী। খেত খামার, ছোট ছোট গ্রাম নদী খাল বিল আর মাঝে মাঝে পাহাড় দেখতে দেখতে চলল রানা। নালগোন্দায় দশ মিনিট থেমে আবার রওনা হলো হেলিকপ্টার। ঘণ্টা দেড়েক চুপচাপ কাটল।

রানা ভাবছে, দুই বছর সোয়া দুই বছর আগের কথা, শায়লা কি চিনতে পারবে ওকে? আর চিনতে পারলেও কি সাহায্য করতে রাজি হবে? ডক্টর আবদুল্লাহ ফৈয়াজই বা সাহায্য করবেন কেন? কেমন যেন দেখতে ছিল শায়লা? একজোড়া প্রাণচাঞ্চল্যে ভরা চোখ আর চিবুকের একটা ছোট্ট তিল ছাড়া স্পষ্ট কিছুই মনে নেই রানার। রানা নিজেই ওকে চিনতে পারবে কিনা তাতেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে ওর। তখন তরুণী ছিল, এখন যুবতী হয়েছে শায়লা। চেহারাতেও নি য়ই পরিবর্তন হয়েছে অনেক।

হঠাৎ মনে পড়ল রানার একটি চুম্বনের কথা। মিট মিট করে আকাশে জ্বলছিল অসংখ্য তারা- হু-হু বাতাস- লরীর একটানা শব্দ, আর আলতো একটি চুম্বন। একটি তরুণীর প্রথম প্রেম নিবেদন নয় তো?

কাগজগুলো দেখা শেষ হতেই ভাঁজ করে পকেটে রেখে দিল প্রফেসর। তারপর আবার শ্লেষ্□াজড়িত ফ্যাশফেঁশে গলায় গল্প আরম্ভ করল।

'কোলায়ের লেকের একটা দ্বীপের মধ্যে এই ক্লিনিকটা। প্রকাণ্ড লেক। বারো মাইল চওড়া, বিশ মাইল লম্বা। কয়েক হাজার বছর আগে পাহাড়ী এলাকা ছিল এটা। খুব সম্ভব পাহাড় ধসে গিয়েই তৈরি হয়েছে এই প্রকাণ্ড লেক। ভূতত্ত্ববিদদের মতে পুবে গোদাবরী আর প িমে কৃষ্ণা নদী থাকায় ভূপৃষ্ঠ নরম হয়ে গিয়ে পাহাড়ের ওজন আর ধারণ করতে পারেনি, ফলে বসে গেছে এই সম্পূর্ণ পাহাড়ী এলাকাটা। জল এসে জমেছে স্বভাবতই। কয়েকটা শিখর কেবল জেগে আছে জলের ওপর।' স্কুল মাস্টারের ভঙ্গিতে একঘেয়ে কণ্ঠে বক্তৃতা দিয়ে চলেছে যেন সে ঘণ্টা পড়ার অপেক্ষায়।

'ক্লিনিকের পক্ষে জায়গাটা একটু অদ্ভুত না? মানে, রোগীদের আনা নেয়া করতে অসুবিধা হয় না আপনাদের?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আসলে এটা যতখানি না ক্লিনিক, তার চেয়ে বেশি রিসার্চ সেণ্টার। বিশেষ ধরনের রিসার্চ হচ্ছে এখানে। খুব বেশি রোগী আনা নেয়া করতে হয় না আমাদের। বেশির ভাগ রোগীই যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত বিকৃতমস্তিষ্ক

কয়েদি। তাছাড়া স্টাফ কোয়ার্টার আছে, সব রকমের সুবিধা আছে, আমাদেরকেও খুব একটা বাইরে যেতে হয় না। আপনি ওখানে গেলেই বুঝতে পারবেন ওঙ্কার দ্বীপ সবদিক থেকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ। আমাদের নিজেদের জেনারেটিং প্ল্যান্ট, সিউয়েজ ডিস্পোজাল ইউনিট, ওয়াটার পাম্পিং অ্যাণ্ড পিউরিফাইং ইকুইপমেন্ট আছে।'

ইলোরের ওপর দিয়ে চলেছে এখন হেলিকপ্টার। রেল-স্টেশনে দাঁড়িয়ে ফোঁস ফোঁস ধোঁয়া ছাড়ছে একটা মেল ট্রেনের এঞ্জিন। নিচের দিকে চেয়ে গোটা শহরটার একটা মোটামুটি ধারণা নিয়ে নিল রানা।

জলহস্তীর পিঠের মত উঁচু হয়ে আছে দ্বীপটা প্রকাণ্ড লেকের মধ্যে। এরই নাম ওঙ্কার দ্বীপ। কয়েকটা দালান-কোঠা দেখতে পেল রানা দ্বীপের পি ম পাশে। সেগুলো থেকে বেশ খানিকটা দূরে উত্তর পাশে প্রকাণ্ড একটা গোলাকার ট্যাঙ্ক দাঁড়িয়ে আছে ছয় পায়ে ভর দিয়ে- রানা আন্দাজ করল খুব সম্ভব ফুয়েল ট্যাঙ্ক হবে। তারই পাশাপাশি দ্বীপের উত্তর-পি ম পাশে ছোট্ট একটা জেটি দেখা যাচ্ছে। সেখান থেকে সরু একটা পিচ-ঢালা সড়ক সোজা এসে ঢুকেছে দ্বীপের ঠিক মাঝখানে চারদিক ঘেরা মস্ত একটা এলাকার গেট দিয়ে। অনেকগুলো বড় বড় দালান-কোঠা দেখা গেল সেই সুরক্ষিত এলাকার ভিতর। আর একটু এগোতেই রানা দেখল একটা নয়, দু'দুটো দেয়াল দিয়ে ঘেরা আছে বাড়িগুলো। গার্ডদের টাওয়ারও দেখা গেল। রানা বুঝল, ওটাই রিসার্চ সেন্টার।

জেটির কাছেই একটা ছোট্ট কাঁটাতার ঘেরা জায়গায় নামল হেলিকপ্টার। এঞ্জিন বন্ধ করে অল্পক্ষণ অপেক্ষা করল পাইলট- রোটরগুলো থেমে আসতেই নেমে গিয়ে দরজা খুলে দিল।

রানাকে নিয়ে এগোল প্রফেসর। বলল, 'এইটুকু রাস্তা হাঁটতে আপত্তি নেই তো আপনার? এই দশ মিনিটের পথ।'

'না, না। আপত্তি কিসের? এতক্ষণ বসে থাকার পর হাঁটতে বরং ভালই লাগবে,' বলল রানা।

ডানধারে অনেকগুলো ব্যারাক দেখা গেল।

'ট্রুপ থাকে এখানে,' রানার উৎসাহ দেখে বলল প্রফেসর। 'দ্বীপ রক্ষী-বাহিনী। আড়াইশো সশস্ত্র সৈন্য আছে এই দ্বীপে।'

'প্রয়োজনের তুলনায় একটু বেশিই মনে হচ্ছে।'

'তা মনে হতে পারে অবশ্যি, কিন্তু আসলে আমাদের সত্যিকার প্রয়োজনের তুলনায় সৈন্য সংখ্যা কিছু কমই হয়ে গেছে।'

নীরবে হাঁটল ওরা কিছুক্ষণ। প্রথম গেটটার সামনে এসে দাঁড়াতেই সেন্ট্রি বক্সে দাঁড়িয়ে থাকা প্রহরী সুইচ টিপল একটা। খুলে গেল সামনের গেট।

'ভিতরে ঢোকা অপেক্ষাকৃত সহজ,' বলল প্রফেসর সন্তোষ সন্তুষ্টির হাসি

হেসে, 'কিন্তু এখান থেকে বেরোনো খুব মুশকিল। মেইন সিকিউরিটি অফিস থেকে টেলিভিশন ক্যামেরার মাধ্যমে প্রত্যেকের গতিবিধি দেখতে পাচ্ছে ডিউটি অফিসার। সে যদি ভিতরে বসে একটা বোতাম না টিপত, তাহলে এই গার্ড ওর সামনের বোতামটা হাজার টিপলেও খুলতে পারত না গেট।'

বিশ গজ গিয়ে থামল আবার ওরা আরেকটা গেটের সামনে। এই গেট এবং দেয়াল প্রথমটার চেয়ে অনেক উঁচু। ইনসুলেটার দেখে রানা বুঝল- ইলেকট্রিফায়েড। ঠিক আগের নিয়মেই খুলে গেল গেটটা। এগোল ওরা এবার রিসার্চ ল্যাবরেটরির দিকে।

'এই হচ্ছে আমাদের সিক্ ওয়ার্ড, আর ওই যে দেখছেন, ওটা ল্যাবরেটরি।' গর্বের সঙ্গে হাত বাড়িয়ে দেখাল সন্তোষ মুখার্জী, 'এর প্রত্যেকটি আবার আণ্ডারগ্রাউণ্ড প্যাসেজ দিয়ে ইন্টারকানেক্টেড। বিশেষ যত্নের সঙ্গে মাটির নিচেও ওয়ার্ড বানাতে হয়েছে আমাদের টেম্পারেচার কনস্ট্যাণ্ট রাখবার জন্যে।'

আঙুল দিয়ে ডানদিকে দেখাল এবার প্রফেসর। 'ওই দেখুন আমাদের পাম্প হাউজ আর পাওয়ার জেনারেটার। এমন কি ইমার্জেন্সি জেনারেটিং প্ল্যাণ্টও আছে আমাদের। স্বয়ংসম্পূর্ণ। রেডিও আছে, টেলিফোন আছে। কি নেই? ওই দেখুন, ওটা আমার কোয়ার্টার, পাশেরটায় থাকে এখানকার সিকিউরিটি কমাণ্ডার ক্যাপ্টেন খান্না। আর এই হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ব্লক।'

অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিং-এর একটা বন্ধ দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ওরা। দরজার পাশে দেয়ালের গায়ে চারকোনা একটা স্পিকিং গ্রিল। ওটার সামনে দাঁড়িয়ে নিচু গলায় কি যেন বলল প্রফেসর। খুলে গেল দরজা। ইউনিফরম পরা দু'জন মিলিটারি গার্ড বসে আছে একটা গ্লাস-পার্টিশন দেয়া ঘরে, দরজা দিয়ে ঢুকলে হাতের ডানধারে।

'আপনাকে ডক্টর ফৈয়াজের অফিসে পৌঁছে দিয়ে আপাতত আমি আমার নিজের কাজে যাব। উনিই আপনার কেসটার চার্জে আছেন।'

একটা ছোট্ট অফিস কামরায় রানাকে ঢুকিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করতে বলে চলে গেল প্রফেসর মুখার্জী। কেউ নেই ঘরের মধ্যে। একটা পুরানো ডেস্কের ওপাশে একখানা চেয়ার, এপাশে দু'খানা- এই হচ্ছে ঘরের আসবাব। জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াল রানা। স্টীলের রড দিয়ে তৈরি করা হয়েছে জানালার গরাদগুলো। জানালার ওপাশে একটা ল্যাবরেটরির কিছু অংশ দেখা যাচ্ছে।

ডেস্কের পিছনের একটা দরজা খুলে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকল বাইশ-তেইশ বছর বয়সের একটি মেয়ে। কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ একদৃষ্টে চেয়ে থাকল সে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকা মাসুদ রানার দিকে। তারপর কোমল কণ্ঠে ডাকল, 'মাসুদ রানা!'

চমকে ফিরে চাইল রানা। দেখল হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে শায়লা। এই সোয়া দুই বছরে আরও অনেক সুন্দর হয়েছে শায়লা। একহারা দীঘল দেহে এসেছে লাবণ্য। মুখের ভাবে মনে হলো অনেক পরিণতও হয়েছে যেন। নীল একটা শাড়ি কুঁচি দিয়ে পরা, মুখে সামান্য প্রসাধনের আভাস।

'শায়লা! আমি...'

থেমে গেল রানা। ঠোঁটে আঙুল রেখে চুপ করবার ইঙ্গিত করছে শায়লা।

'আপাতত আমার কয়েকটি প্রশ্নের জবাব দিলেই আপনার জন্যে নির্দিষ্ট কামরায় গিয়ে বিশ্রাম নিতে পারবেন,' বলল শায়লা।

'নিশ্চয়ই।'

ডেস্কের ওপর থেকে একটা ফরম নিয়ে লিখতে বসল শায়লা।

'আপনার পুরো নাম?'

'দিন না, আমিই লিখে দিচ্ছি,' বলে কাগজটা টেনে নিয়ে রানা লিখল, 'তোমার সাথে অনেক কথা আছে, শায়লা। কখন এবং কোথায় সেটা সম্ভব হবে?'

'হ্যাঁ। এবার আপনার বয়স আর জন্মস্থান লিখুন পরের কলামে।' কাগজ কলম টেনে নিয়ে শায়লা লিখল, 'ধৈর্য ধরো, ব্যবস্থা করছি।'

ফরমটা লেখা হয়ে যেতেই শায়লা বলল, 'এবার দয়া করে একটু পাশের ঘরে আসুন, আপনাকে পরীক্ষা করতে হবে। তারপর আজ রাত্রির মত বিশ্রাম নেবেন আপনি। কাল সকাল থেকে চিকিৎসা শুরু হবে আপনার।'

ব্লীচিং পাউডার আর ডেটল-ফেনাইলের গন্ধ পাশের ঘরে। দরজা বন্ধ করে দিল শায়লা। তারপর ডাক্তারী চালে বলল, 'জামা-কাপড় সমস্ত খুলে ফেলুন।'

বোকার মত দাঁড়িয়ে রইল রানা। মুচকে হাসছে শায়লা ওর দিকে চেয়ে। স্টেইন্‌লেস স্টীল স্টেরিলাইজারের সামনে গিয়ে বোতাম টিপে চালু করে দিল শায়লা সেটা। ঢাকনিটা খুলে কয়েকটা যন্ত্রপাতি ফেলল তার মধ্যে সশব্দে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই সোঁ সোঁ করে বাষ্প বেরোতে আরম্ভ করল ওটা থেকে। ঘুরে দাঁড়াল শায়লা।

'এবার কথা বলতে পারো। কিন্তু আস্তে। মাইক্রোফোন আছে সব ঘরে।'

'মাইক্রোফোন কেন?'

'তা জানি না, ক্যাপ্টেন খান্না সারাক্ষণ সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে আমাদের ওপর।'

'তোমাদের বিশ্বাস করে না ওরা?'

'দুই-দুইবার পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলে কি করে আর বিশ্বাস করবে বলো?'

'তোমার আব্বা জানেন যে আমি এসেছি এখানে?'

'আমরা গতকাল সন্ধ্যায়ই খবর পেয়েছি। তোমার কথা আব্বার মনে ছিল না, আমি বলতেই মনে পড়েছে। তুমি আমাকে রক্ষা করছিলে আম্বালা হাসপাতালে একজন ক্যাপ্টেনের হাত থেকে।' একাগ্র দৃষ্টিতে রানার মুখের দিকে চেয়ে আছে শায়লা। 'এবং এখন এখানে এসেছ তোমার ঋণ কিয়দংশে শোধ করতে পারি সেই আশায়। তুমি সাদেক খানকে নিতে এসেছ, রানা।'

চম্‌কে উঠল রানা। 'সে কথা তুমি জানলে কি করে?'

'অত্যন্ত সহজ যুক্তির বলে। আমি জানি যত বড় প্রমাণই তোমার বিরুদ্ধে থাকুক না কেন, প্রাণ গেলেও তুমি নিজের দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। কাজেই তোমার এখানে আসার সাদেক খান ছাড়া আর কি কারণ থাকতে পারে? তোমাকে কি খুন করে রেখে যাবার আদেশ দেয়া হয়েছে?'

'না। নিতান্ত বাধ্য না হলে হত্যা করা হবে না। ওকে ফেরত চাই আমরা।'

স্পাকিস্তানে ফেরত নিতে চাও ওকে?' আশ্চর্য হয়ে গেল শায়লা। 'কি করে নেবে ওকে পাকিস্তানে?'

'তোমাদের সাহায্যে। তোমার আব্বা কোথায়?'

'কাজ করছেন ল্যাবরেটরিতে। এসে পড়বেন। কিন্তু আমরা সাহায্য করলেও তোমার পক্ষে ওকে নিয়ে পাকিস্তানে ফেরা অসম্ভব মনে হচ্ছে আমার কাছে। ভয়ঙ্কর রকমের পাগল লোকটা। খুনী। সিকিউরিটি ওয়ার্ডে রাখা হয়েছে ওকে। এক সময় তো আমরা ভেবেছিলাম মেরে ফেলতে হবে বুঝি, মাঝে মাঝে ওর উন্মত্ততা এতই মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত প্রফেসর সন্তোষ এক বিকল্প উপায় বের করেছে ওকে কিছুটা শান্ত রাখার জন্যে।'

'কি রকম?'

'স্ত্রীলোক নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেছে সে ইলোর থেকে।' একটু ইতস্তত করে বলল, 'প্রস্‌টিটিউট।'

অবাক হয়ে গেল রানা। বলল, 'সাদেক খানকে নির্বিঘ্নে খুন করতে দিচ্ছে প্রফেসর? শুনেছি মেয়েদের খুন করে লোকটা উন্মত্ত অবস্থায়?'

মাথা ঝাঁকাল শায়লা। 'কেবল খুন করতে দিচ্ছে তা নয়, এ থেকে প্রচুর আনন্দ লাভ করছে সে। ঘরের মধ্যে লুকানো ক্যামেরায় সাদেক খানের প্রত্যেকটি কার্যকলাপের ছবি তুলে ভেট দিচ্ছে কর্নেল বটব্যালের বিকৃত

মনোবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্যে।'

নিজের অজান্তেই শিউরে উঠল রানা একবার। বলল, 'আশ্চর্য লোক তো।'

'লোকটা একটা পিশাচ। আব্বার পিছনে স্পাইয়ের মত লেগে আছে সে সারাক্ষণ। বুঝবার ক্ষমতা নেই, মাথায় কুলোয় না- অথচ সে চায় এই গবেষণার সমস্ত সুনাম যেন ওর হয়। সাপের চেয়েও বিষাক্ত লোকটা।'

'সাদেক খানের ব্যাপারে কতদূর এগিয়েছে তোমাদের কাজ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'এক সপ্তাহের মধ্যেই রেডি হয়ে যাবে মেশিন। তিন হাজার মাইল পর্যন্ত টেস্ট করে দেখেছি আমরা ইতিমধ্যেই।'

'কি ধরনের মেশিন সেটা? আমাদের ধারণা তোমরা ওর ব্রেন ওয়েভগুলো কমপিউটারাইজ করতে যাচ্ছ।'

'ব্যাপারটা অত্যন্ত টেকনিকাল। তবে খুব সহজ করে বলতে গেলে ব্যাপারটা মোটামুটি তাই দাঁড়ায়। আসলে হিটারো সাইকি পেনিট্রেট করবার যন্ত্র তৈরি করছি আমরা। একটা রেডিও রিসিভার ইচ্ছেমত যে কোনও মানুষের মনের উপর টিউন করা গেলে যে অবস্থা হত অনেকটা তাই ঘটাবার চেষ্টা চলছে এখানে। যে-কোনও লোকের যে-কোন রকমের চিন্তা ইচ্ছে করলে জানতে পারি আমরা।'

'আমার মাথায় ঠিক ঢুকছে না ব্যাপারটা। ধরো রেডিও সেটের দৃষ্টান্তই যদি নিই, ওয়েভ লেংথ জানা থাকলে পরে তবেই তুমি একটা বিশেষ স্টেশন ধরতে পারো। তাই না? কোনও বিশেষ মানুষের মনের বা চিন্তার ওয়েভ লেংথ জানবে কেমন করে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ব্রেন চার্ট তৈরি করা অত্যন্ত সহজ ব্যাপার। সেটারও সহজ উপায় বের করেছি আমরা। ঠিকই বলেছ, ওই চার্ট ছাড়া কারও থট্ রিডিং সম্ভব নয়।'

'কিভাবে পাবে তোমরা চার্ট?'

'নানান কায়দায় সমস্ত পৃথিবীর নেতৃস্থানীয় বৈজ্ঞানিক, সেনাপতি আর শাসকবৃন্দের ব্রেন চার্ট জোগাড় করবার জন্যে দিনরাত পরিশ্রম করছে ভারতের পাঁচ-ছয়শো সিক্রেট এজেন্ট। এরই মধ্যে আমাদের হাতে পৌঁছে গেছে প্রায় সাড়ে তিনশো চার্ট।'

'কয়টা কমপিউটার তৈরি হচ্ছে?'

'আপাতত একটা। এটা সম্পূর্ণ হয়ে গেলে অতি সহজে বানানো যাবে এর পরেরগুলো। যত ইচ্ছা তৈরি করা যাবে তখন।'

'ধরো, যদি যন্ত্রটা নষ্ট করে দেয়া হয়, আরেকটা যন্ত্র তৈরি করতে পারবে ওরা?'

'যদি আব্বাকে দিয়ে করায় তাহলে পারবে। অবশ্য অ্যাডজাস্টমেণ্টের

জন্যে সাদেক খানের ব্রেনও প্রয়োজন পড়বে।'

স্প্ল্যানের কোনও কপি নেই ওদের কাছে?'

'আছে, ব্লু প্রিন্ট আছে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা জায়গায় আব্বা ইচ্ছে করেই ভুল তথ্য দিয়েছেন ওদের। কবীর চৌধুরী বলে একজন লোকের ওপর আব্বার খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা জন্মেছে ইদানীং। বোধহয় মুসলমান বলেই। তাছাড়া লোকটা ভদ্রও খুব। ওরই চেষ্টায় জেল থেকে ছাড়া হয়েছে আব্বাকে। ওরই নির্দেশে এই কাজটা করছেন তিনি। শেষের কিছু অংশ ছাড়া বেশির ভাগ আসল কপিই এখন কবীর চৌধুরীর কাছে।'

ভ্রূ কুঁচকে গেল রানার। কবীর চৌধুরী সম্পর্কে কিছু বলতে যাচ্ছিল- চেপে গিয়ে অন্য কথায় চলে এল সে।

'তোমার আব্বা জেলে ছিলেন?'

'হ্যাঁ। দেড় বছর। তুমি আমাকে উদ্ধার করে রেখে এলে নয়াদিল্লীতে। পরদিন ভোরেই মিলিটারি এসে ধরে নিয়ে গেল আমাদের। সাত দিন সাত রাত অকথ্য অত্যাচার করা হলো আমাদের ওপর। কোন তথ্য বের করতে না পেরে ছেড়ে দিল। নজরবন্দী করে রাখা হলো আমাদের। ইউনিভারসিটির চাকরি চলে গেল আব্বার। আমরা প্ল্যান করলাম, পাকিস্তানে চলে যাব, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করল একজন। যেদিন আমাদের পালিয়ে যাওয়ার কথা তার আগের রাতে ধরে নিয়ে গেল ওরা আব্বাকে। আমি ঘুমিয়েছিলাম- হৈ-হল্লা শুনে ছুটে গেলাম। দেখলাম ছেঁচড়ে টেনে সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওরা আব্বাকে। ছুটে গেলাম। এক ধাক্কায় আমাকে মাটিতে ফেলে দড়াম করে দরজা লাগিয়ে চলে গেল ওরা।'

মরার মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে শায়লার মুখ। ঠিক যেন নালিশ জানাচ্ছে সে রানার কাছে। ডান হাতটা রাখল রানা ওর কাঁধের ওপর। বলল, 'তোমার কষ্ট হচ্ছে, শায়লা।'

'না।' নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে সামলে নিল শায়লা নিজেকে। খানিকটা সুস্থির হয়ে আবার আরম্ভ করল সে।

'দেড় বছরের জন্যে আব্বার সঙ্গে ওই আমার শেষ দেখা। তিন মাস প্রত্যেকদিন হাঁটাহাঁটি করেছি আমি ওদের মিলিটারি হেড কোয়ার্টার আর সেণ্ট্রাল জেল সুপারের কাছে। ওরা হেসেছে, বলেছে ওরা জানে না কোথায় আছে ডক্টর ফৈয়াজ, আর জানলেও বলত না। ছয় মাস পর হোস্টেলে এসে দেখা করল আমার সাথে মিলিটারি হেড কোয়ার্টারের একজন অফিসার। ও বলল, আব্বার সব খবর জানাতে পারে সে, বিনিময়ে আমি যদি...'

থেমে গেল শায়লা। একটা চেয়ারের মাথা আঁকড়ে ধরল বাম হাতে।

'থাক, শায়লা,' বলল রানা। 'ওসব কথা আর মনে নাই আনলে। ভুলে যাবার চেষ্টা করো।'

'না। বলতেই হবে আমাকে। তোমাকে বলব না তো কাকে বলব? ওর জঘন্য প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে নিয়ে ও আমাকে জানাল যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে আব্বাকে। ও বলল, আমি যদি সহযোগিতা করি, যদি নিয়মিত ওর ইচ্ছা পূরণ করে যাই তাহলে ওর মারফত কিছু বই, খাবার পাঠাতে পারি আব্বাকে।

'আমি তখন থার্ড ইয়ারে পড়ি। টাকা ছিল না আমার কাছে। কিন্তু আমি ছাড়া যে আব্বার আর কেউ নেই। ভাল ছাত্রী ছিলাম, আমার টিউশন ফি লাগত না, কিন্তু হোস্টেল খরচ আমার নিজেকেই চালাতে হত। দু'একজন বান্ধবী দয়া পরবশ হয়ে সাহায্য করত, আর টিউশনি করতাম। আব্বার জন্যে খাবার আর বই পাঠানো আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আরও একটা টিউশনি নিলাম। দিনে আঠারো বিশ ঘণ্টা করে কাজের চাপ পড়ত। স্বাস্থ্য ভেঙে পড়তে আরম্ভ করল। কিন্তু প্রতি সপ্তাহে আমি টিন ভর্তি খাবার আর এক-আধটা বই কিনে দিয়ে আসতে থাকলাম সেই অফিসারের কোয়ার্টারে। এক বছর চলল এই রকম।

'কিন্তু ক্রমেই অসন্তুষ্ট হয়ে উঠতে আরম্ভ করল লোকটা। সারাদিন পরিশ্রম করে এত ক্লান্ত থাকতাম যে ওকে সন্তুষ্ট করা সব সময় সম্ভব হয়ে উঠত না আমার পক্ষে। একদিন লাথি মেরে তাড়িয়ে দিল ও আমাকে। অনেক অনুনয়-বিনয় করলাম, ধরনা দিয়ে পড়ে থাকলাম, কথা দিলাম আমার সাধ্যমত সবকিছু করব ওকে সন্তুষ্ট করার জন্যে- শুধু পার্সেলগুলো আব্বার কাছে পাঠানো যেন সে বন্ধ না করে। শুনল না। ওর হাত ধরতে গিয়েছিলাম, থুথু দিল আমার মুখে। তারপর টেনে নিয়ে গেল কোয়ার্টারের পিছনের ছোট্ট উঠানে। এক কোণে জড়ো করা আছে ভাঙা টিনগুলো- বইগুলো গাদা করা আছে তার পাশেই। পুরো একটা বছর নিজের ওপর কি কঠোর নির্যাতন করে আব্বার জন্যে কিনেছিলাম আমি ওগুলো। ও বলল, খাবারগুলো নিজে খেয়ে টিনগুলো জমিয়ে রেখেছে সে এতদিন, বিদায়ক্ষণে আমাকে দেখাবে বলে।'

টপ টপ করে পানি পড়ছে শায়লার গাল বেয়ে। মাথার মধ্যে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে রানার। নিজের অজান্তেই দাঁতে দাঁত চেপে চোয়াল দুটো ব্যথা হয়ে গিয়েছে। বহুকষ্টে নিজেকে সংযত করল রানা। তারপর মুছে দিল শায়লার চোখ। একটি কথাও বেরোল না ওর মুখ থেকে। কি চমৎকার উদ্ধার করেছিল সে শায়লাকে! এখন এসেছে সে উপকারের প্রতিদান গ্রহণ করতে!

'দোষী মনে করে শুধু শুধু নিজেকে কষ্ট দিয়ো না, রানা। তোমার কোনও দোষ নেই। দোষ আমার কপালের।' একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল শায়লা। ছ'মাস আগে ছেড়ে দিয়েছে ওরা আব্বাকে হঠাৎ কবীর

চৌধুরীর অনুরোধে। এখানে নিয়ে এসে গবেষণায় লাগিয়েছে। কাজ শেষ হয়ে গেলেই আবার জেলে পোরা হবে ওঁকে। তাই সময় নিচ্ছেন আব্বা এত, প্ল্যান খুঁজছেন এখান থেকে পালিয়ে যাবার। তুমি এসেছ সাদেক খানকে পাকিস্তানে ফিরিয়ে নিতে, আমরা তোমাকে এই ব্যাপারে সাহায্য করব, রানা, যদি আমাদের সাথে নাও।'

'এত লোক একসাথে পালানো তো মুশকিল হয়ে যাবে, শায়লা। আমি সাদেক খানকে রেখে যদি আবার ফিরে আসি তাতে হবে না?'

'না, ততদিনে মেরে ফেলবে ওরা আব্বাকে।'

'তোমার আব্বা কি বলেন? তোমরা নিশ্চয়ই আলাপ করেছ এই ব্যাপারে?'

'হ্যাঁ। যখনই তোমার সংবাদ শুনলাম তখনই বুঝতে পেরেছি আমরা তোমার উদ্দেশ্য। এইটাই আমাদের শেষ সুযোগ, রানা। এইটুকু সাহায্য করবে না আমাকে?'

'গতবার ফুটন্ত কড়াই থেকে উদ্ধার করে তোমাকে আগুনে ফেলেছিলাম, শায়লা। যদি বলো চেষ্টা করব আমি। কিন্তু তাতে করে সবাই একসাথে মারা পড়ব- কারও কোনও লাভ হবে না।'

'কোন্ পথে কি ভাবে পালাবে ঠিক করেছ?' জিজ্ঞেস করল শায়লা।

'কয়েকটা পথ আছে। নরসাপুরে অপেক্ষা করছে আমাদের সাবমেরিন। কিন্তু ওখানে পৌঁছবার কোনও উপায় দেখতে পাচ্ছি না। খুব সম্ভব হায়দ্রাবাদের দিকেই যাব। ওখানে আমাদের এজেন্ট আছে- মাদ্রাজে নোঙর করা একটা ইটালিয়ান জাহাজে আমাদের তুলে দেয়ার ব্যবস্থা করবে সে। দেখা যাক। এখানে দুই-একদিন থাকলেই পালাবার একটা রাস্তা বের করে ফেলব।'

'কবে নাগাদ পালাতে চাও?'

'তাড়াহুড়োর কিছুই নেই। এত লম্বা জার্নি করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আমি। দু-তিনদিন বিশ্রাম নেব, ধীরে সুস্থে এই দ্বীপটাকে স্টাডি করে তারপর হঠাৎ গায়েব হয়ে যাব সুবিধা মত।'

'সন্তোষ মুখার্জী হঠাৎ ফিরে আসায় ঘাবড়ে গেছি আমি। লোকটা অসম্ভব ধূর্ত। ওর ব্যাপারে খুব সাবধানে থাকতে হবে রানা। ওর ফিরবার কথা ছিল আরও কয়েক দিন পর, অথচ...'

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল রানার। চমকে উঠল সে ভিতর ভিতর।

'শায়লা! সন্তোষ মুখার্জী এই দ্বীপের বাইরে ছিল। হায়দ্রাবাদে ওষুধ কিনতে গিয়েছিল সে। কবে গিয়েছিল সে এখান থেকে?'

'গত পরশুদিন সকালে। কেন?'

'এর মধ্যে ক্লিনিকের সাথে কোন কথাবার্তা হয়েছে ওর?'

'না, সেটা সম্ভব নয়। হায়দ্রাবাদ থেকে এখানে যোগাযোগের কোন

ব্যবস্থা নেই। আমরা ডাইরেক্ট দিল্লী হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে কানেক্টেড। কিন্তু কেন? কি হয়েছে?'

'সর্বনাশ হয়ে গেছে, শায়লা। আমার সম্বন্ধে সব কিছু জানল কি করে সন্তোষ মুখার্জী? এখানে খবর পৌঁছেচে কাল সন্ধ্যায়, তার আগের দিন সকালে সে হায়দ্রাবাদ চলে গেছে- অথচ আমার সম্পর্কে সবকিছু জানল কি করে? প্লেনটা ক্র্যাশও করেনি তখন। গত পরশুদিন সকালে আমি ছিলাম মান্দালয়ে।'

'তাই তো! আশ্চর্য!'

'এর একটি মাত্র ব্যাখ্যা আছে। আগে থেকেই জানত সে আমার কথা। তার মানে কি? শায়লা, এরা আগে থেকেই জানত আমি আসছি। সবকিছুই আগে থেকে প্ল্যান করা। জাল পেতেছিল ওরা আমার জন্যে। এদের তৈরি ফাঁদে ঢুকে পড়েছি আমি!'

বিবর্ণ হয়ে গেল শায়লার মুখ। বলল, 'তাহলে? কি হবে এখন?'

স্পালাতে হবে। ওরা মনে করবে ক্লান্ত হয়ে আছি, আজ রাতটা বিশ্রাম নেব আমি। তাই আজই পালাতে হবে আমাদের।'

'কি করে?'

'তা জানি না। একটা কিছু প্ল্যান ঠিক করতে হবে খুব তাড়াতাড়ি। এছাড়া আর কোন উপায় নেই এখন। গতি দিয়ে ধুলো দিতে হবে ওদের চোখে।'

'আমাদের নিচ্ছ তো?'

একটু দ্বিধা করল রানা। তারপর বলল, 'হ্যাঁ।'

'আমার গা ছুঁয়ে বলো।'

'ছেলেমানুষী কোরো না, শায়লা!' ধমক দিল রানা। তারপর ওর হাত ধরে বলল, 'কথা দিলাম, নিয়ে যাব- অন্তত চেষ্টা করব।'

উদ্ভাসিত হয়ে উঠল শায়লার দুই চোখ। রানার হাতটা তুলে চুম্বন করল সে। 'বাঁচালে আমাকে, রানা।'

হাতটা কেড়ে নিল রানা। 'তোমার উচ্ছ্বাস রাখো এখন, শায়লা। এই দ্বীপের একটা নক্সা এঁকে দাও জলদি। ঠিক কোন জায়গাটায় কম্পিউটার আছে এঁকে দেখাও আমাকে। যাবার আগে ওটাকে শেষ করে দিয়ে যেতে হবে।'

ঠিক এমনি সময়ে কামরার দরজাটা খুলে গেল দু'পাট। একজন বদ্ধ ভদ্রলোক ঢুকলেন ঘরে। একমাথা এলোমেলো পাকা চুল, গাল ভেঙে বসে গেছে, দুই চোখের কোলে কালি, কপালে বয়স এবং নির্যাতনের চিহ্ন। প্রথমে চিনতে পারেনি রানা, পরমুহূর্তে সদাহাস্যময় একটা সৌম্য চেহারা মনে পড়ল ওর- সোয়া দুই বছর আগে দেখেছিল একবার। চেনাই যায় না

এই মানুষকে সেই মানুষ বলে।

ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন বদ্ধ শীর্ণ একটা হাত সামনে বাড়িয়ে।

'মাসুদ রানা! মাসুদ রানা! ঠিক চিনতে পেরেছি আমি। আমাদের নেবে তুমি, রানা, তোমার সঙ্গে?'

বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল রানা ডক্টর আবদুল্লাহ্ ফৈয়াজের দিকে। উত্তর বেরোল না ওর মুখ থেকে।

'ও আমাকে কথা দিয়েছে, আব্বাজী,' বলল শায়লা। হতবুদ্ধি রানার দিকে ফিরে চাইল শায়লা এবার। 'আমি দুঃখিত, রানা। আগে বলিনি, বললে তুমি রাজি হতে না কিছুতেই। গুলি করেছিল ওরা আব্বার পায়ে জেল থেকে পালাবার চেষ্টা করায়। ফেলে রেখেছিল সাতদিন বিনা চিকিৎসায়। দুটো পা-ই হাঁটু পর্যন্ত কেটে বাদ দিতে হয়েছে। হুইল চেয়ার ছাড়া চলাফেরা করতে পারেন না আব্বা।'

ছয়

মাথা গুঁজে পড়ে আছে রানা ঘাসের ওপর। ঠিক এই জায়গায় গার্ড থাকতে পারে কল্পনাও করতে পারেনি সে। হাওয়াটা উল্টোদিকে বইছে বলে সিগারেটের গন্ধও আসেনি নাকে। বুকে হেঁটে এগোচ্ছিল রানা অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে- পাঁচ হাতের মধ্যে চলে আসার পর হঠাৎ চোখে পড়েছে ওর সিগারেটের আগুন। জোনাকীর মত জ্বলছে-নিভছে। পাথর হয়ে জমে গেছে সে। তিন মিনিট ধরে মুখ গুঁজে পড়ে আছে সে মাটিতে- দেরি হয়ে যাচ্ছে, অথচ নড়বার নাম নেই গার্ডটার। একমনে সিগারেট ফুঁকছে সে, আর ডাইনে-বাঁয়ে চাইছে, পাছে ডিউটি সার্জেন্টের কাছে ধরা পড়ে যায়। ভাগ্যিস পিছন ফিরে চাইছে না সে!

টর্চ না জ্বালালে অবশ্য অন্ধকারের মধ্যে কালো পোশাক পরা রানাকে দেখতে পাবে না সে পিছন ফিরলেও- কিন্তু সরছে না কেন ব্যাটা। রানার দশ গজ পিছনে দুই নম্বর দেয়াল। দেয়ালের ওপাশে ফ্লাড লাইট জ্বেলে দুর্ভেদ্য করা হয়েছে দুই দেয়ালের মাঝের ফাঁকা জায়গাটা। আর টেলিভিশন ওয়াচ-টাওয়ারের মাথায় বসানো সার্চলাইটটা সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে দেয়ালের এপাশটায়। যে-কোন মুহূর্তে আলো এসে পড়তে পারে রানার ওপর। এখন

ছুটাছুটি করছে ওটা পাওয়ার হাউসের দিকটায়।

দূরে হুইস্লের শব্দ শোনা গেল। চঞ্চল হয়ে উঠল গার্ডটা। কষে দু'তিনটে সুখ টান দিয়ে ফেলে দিল সিগারেট, খ্যাক্-থু করে থুথু ফেলে আগুনটা মাড়িয়ে চলে গেল সে হুইস্লের শব্দ লক্ষ্য করে। স্টেনগানটা কাঁধে ঝুলছে মাটির দিকে মুখ করে।

আবার এগোল রানা বুকে হেঁটে। তরল পদার্থ ভর্তি একটা ড্রাম ঠেলে নিয়ে চলেছে সে আগে আগে। আর দেরি করা চলে না। তিন মিনিট পিছিয়ে পড়েছে সে নির্ধারিত সময় থেকে। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিং-এর অফিস, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ আর রেডিও রুম বাঁয়ে রেখে এগিয়ে গেল রানা অন্ধকার ছায়ায় ছায়ায়। গন্তব্যস্থলে এসে পৌঁছেচে সে। এই বাড়ির পিছনেই কোথাও আছে সেই ভেন্টিলেটার।

বেশিক্ষণ খুঁজতে হলো না। দেয়ালের গায়ে বসানো আছে আণ্ডারগ্রাউণ্ড কামরার ইন্টেক্ ভেন্টিলেটার গ্রিল। পেয়ে গেল রানা। হুড লাগানো পেন্সিল টর্চ জ্বেলে নম্বর মিলিয়ে দেখল ঠিকই আছে। কোমরে জড়ানো লম্বা রাবার টিউবটা খুলল সে এবার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। তারপর টিউবের একমাথা ঢুকিয়ে দিল গ্রিলের ফাঁক দিয়ে- ধীরে ধীরে নামিয়ে দিল সেটা নিচের কামরায়। কয়েক ইঞ্চি বাকি থাকতে ড্রামটা কোলে তুলে নিয়ে ওটার গায়ে বসানো একটা ছোট্ট কলের মুখে লাগাল রাবার টিউবের মুখ। এবার কলটা খুলে দিতেই কলকল করে পাইপ বেয়ে নিচের দিকে রওনা হলো ড্রামের তরল পদার্থ।

দু'মিনিট লাগবে ড্রাম খালি হতে। রানার মনটা ফিরে গেল সেই ছোট্ট ঘরে, যেখানে ডক্টর আবদুল্লাহ্ ফৈয়াজ প্রবেশ করতেই নেমে এসেছিল সমাধির মত নিস্তব্ধতা। শায়লা ঠকিয়েছে ওকে…

বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে ছিল রানা। সাদেক খানকে নিয়ে যাওয়াই প্রায় অসম্ভব ব্যাপার- তার ওপর একটি নারী এবং একটি পঙ্গু যদি জোটে তাহলে এক পা-ও এগোতে পারবে না সে। ভয়ানক রাগ হলো ওর শায়লার ওপর। কিন্তু কিছু বলার আগেই কথা বলে উঠলেন ডক্টর ফৈয়াজ।

'এখানে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক হচ্ছে না। ক্যাপ্টেন খান্নাকে এইদিকেই আসতে দেখলাম।'

স্টেরিলাইজার অফ করে দিল শায়লা। বলল, 'দুই-একটা জায়গায় সামান্য একটু আঘাত ছাড়া শারীরিক আর কোন ক্ষতি হয়নি মিস্টার মাসুদ রানার। কিন্তু ওঁর রেস্ট দরকার, আব্বাজী। তোমার ট্রিটমেণ্ট শুরু হওয়ার আগে ভালমত বিশ্রাম দিতে হবে ওঁকে।'

'কিন্তু এদের যে এদিকে তাড়া খুব, শায়লা,' বললেন বৃদ্ধ। 'এই ভদ্রলোকের অ্যামনেশিয়া দুদিনের মধ্যে দূর করবার হুকুম দেয়া হয়েছে

আমাকে। তা ঠিক আছে। ওষুধ খাইয়ে ঘণ্টা কয়েক ঘুম পাড়িয়ে রাখো- আমি না হয় একটু বেশি রাতে আমার ট্রিটমেন্ট শুরু করব।'

'আপনি আসুন আমার সঙ্গে,' বলল শায়লা রানার উদ্দেশে।

একটা করিডর ধরে কিছুদূর গিয়ে লিফটের দিকে এগোল শায়লা। দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল রানা ওর পাশে। বলল, 'অসম্ভব, শায়লা। ভারতীয় এলাকা থেকে...'

চেয়ারটা ঘুরিয়ে লিফটে উঠে পড়লেন ডক্টর ফৈয়াজ। 'চারতলায় কয়েকটা রোগী দেখতে যাব আমি।'

লিফটের দরজা বন্ধ হয়ে যেতেই কিছু বলতে যাচ্ছিল রানা, মাথা নেড়ে নিষেধ করল শায়লা। রানা বুঝল লিফটেও মাইক্রোফোন আছে। লিফট থেকে বেরিয়ে চাপা গলায় বললেন বদ্ধ, 'খাঁচায় পোরা জন্তুর মত আছি আমরা এখানে। সর্বক্ষণ নজর রেখেছে আমাদের ওপর সন্তোষ আর খান্না। এখানে মাইক্রোফোন, ওখানে ক্যামেরা, অসহ্য...'

'আর দেরি নেই, আব্বাজী। রানা কথা দিয়েছে। আমরা পালিয়ে যাব এখান থেকে।'

'আমার কথায় বিশেষ ভরসা কোরো না, শায়লা,' বলল রানা।

'কিন্তু তুমি কথা দিয়েছ...'

'দিয়েছি। বলেছি চেষ্টা করব। চেষ্টায় আর সাফল্যে অনেক তফাৎ। তাছাড়া তোমার আব্বার এই অবস্থার কথা আমি জানতাম না।'

একটা ঘরে এসে পৌঁছল ওরা। মাইক্রোফোন নেই এই ঘরে। দরজা বন্ধ করে দিল শায়লা ভেতর থেকে। ডক্টর ফৈয়াজও এসেছেন ঘরের মধ্যে।

'আমি এই পাগলি মেয়েটাকে অনেক বুঝিয়েছি, মিস্টার রানা,' বললেন বদ্ধ ধীর কণ্ঠে। 'আমার এই অবস্থায় আমাকে সাথে নিলে তোমাদের সবাইকে আমি মস্ত বিপদে ফেলব। তারচেয়ে আমাকে রেখে তোমরা চলে যাও...'

'না। অসম্ভব!' বাধা দিল শায়লা। দৃঢ় সঙ্কল্প তার কণ্ঠে। 'তোমাকে ছেড়ে যাব না আমি। পৃথিবীতে তোমাকে ছাড়া আর কি আছে আমার? তোমাকে ছেড়ে যাব- কোথায় যাব?'

'কিন্তু, শায়লা, ব্যাপারটার সম্ভাব্যতার দিকটাও বিচার করে দেখতে হবে। তুমি বুঝতে পারছ না, কিন্তু আমি পারছি। আমাকে নিয়ে তোমরা মহা সঙ্কটে পড়বে। পদে পদে বাধার সৃষ্টি হবে আমাকে সাথে নিলে।'

রানার দিকে ফিরল শায়লা। বলল, 'রানা। তুমি যদি তোমার কথা না রাখো, তাহলে সাদেক খানের ব্যাপারে কোনও সাহায্য করব না আমি।'

'কিন্তু আমি করব,' বললেন বদ্ধ।

'আমি খান্নাকে জানিয়ে দেব সবকিছু!' জেদ ধরল শায়লা।

‘ছিঃ। এই কথা মুখেও আনতে হয় না, মা। যার কাছ থেকে একবার উপকার পাওয়া যায় তার অমঙ্গলের কথা মুখে আনা তো দূরের কথা, মনে আনাও পাপ!’

চুপচাপ বাপ-বেটির তর্ক শুনছে রানা। দুইজনেরই মনের ভাব উপলব্ধি করতে পারছে সে। যদি এটা কোন বিশেষ অ্যাসাইনমেণ্ট না হত, যে কাজে এসেছে সেটা ভণ্ডুল হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা না থাকত,তাহলে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করত না রানা। কিন্তু আর দ্বিধায় সময় নেই। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে।

‘ঠিক আছে,’ বলল শায়লা এবার রানার দিকে চেয়ে। ‘তাহলে আমাদের দু’জনকেই রেখে চলে যাও তুমি। মৃত্যুই হোক আমাদের। তবু তোমাকে সাহায্য করব আমরা।’

‘বাজে বোকো না, শায়লা,’ বলল রানা শাসনের ভঙ্গিতে। ‘আমি দুঃখিত, তোমাদের এখানে ফেলে রেখে চলে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তোমাকে কথা দিয়েছি- আমার কথা আমি রক্ষা করব। সবাই মিলে বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়লে ভয় খেয়ে পিছিয়েও যেতে পারে বিপদ।’

আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল শায়লার মুখ। খুশি আর রাখতে পারছে না সে ধরে।

‘দেখলে, আব্বাজী? আমি জানতাম! আমি আগেই বলেছিলাম না তোমাকে, বিপদ দেখে পিছিয়ে যাবার মানুষ ও নয়? বলেছিলাম না, রাজি হবে? তুমি মিছেই দ্বিধা-সঙ্কোচ করছিলে।’

‘তবে একটা কথা আগেই পরিষ্কার হয়ে যাওয়া দরকার,’ বলল রানা, ‘যে, আমাদের ধরা পড়বার সম্ভাবনা শতকরা নিরানব্বই ভাগ। ইণ্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের কাছে আমার সত্যিকার পরিচয় এবং উদ্দেশ্য গোপন নেই। কেন ওরা আমাকে নিরাপদে ক্লিনিক পর্যন্ত পৌঁছবার সুযোগ দিয়েছে তা বলতে পারব না…’

‘তোমার স্মৃতি-বিভ্রাট যে ভান, সেকথা জানে ওরা?’ জিজ্ঞেস করলেন বদ্ধ।

‘জানে। সন্তোষের বোকামিতে টের পেয়ে গেছি আমি। হায়দ্রাবাদে হেলিকপ্টারে উঠেই ও প্রকাশ করে দিয়েছে যে ও আমার পরিচয় এবং রোগ সম্বন্ধে ওয়াকেফহাল।’

‘কিন্তু তা কি করে হয়? ও তো ক্লিনিক থেকে গিয়েছিল পরশু সকালে। খবর তো পৌঁছেচে গতকাল সন্ধ্যায়,’ বললেন বদ্ধ।

‘তার মানে আগে থেকেই জানত সে আমার কথা। পাইলটের কাছে আমার নাম শুনেই বুঝতে পেরেছে সবকিছু। অর্থাৎ এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কেটে পড়তে হবে আমাদের। সম্ভব হলে আজই রাতে।’

'ঠিক আছে। আমি এক কাজ করি, খান্না আর সন্তোষকে বলিগু তোমাকে বারো ঘণ্টার জন্যে ঘুমপাড়িয়ে রাখছি আমি, কাল ট্রিটমেণ্ট শুরু করা হবে। এর ফলে অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকবে ওরা। শায়লাকে বুঝিয়ে দাও কি কি করতে হবে আমাদের। আমি ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ফিরে আসবার চেষ্টা করব।' রানার দিকে কয়েক সেকেণ্ড গভীর দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন ডক্টর ফৈয়াজ, তারপর হুইল চেয়ার ঘুরিয়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

'বিছানায় উঠে পড়ো। তোমাকে নজরবন্দী রাখার জন্যে হয়তো অন্য কোন ডাক্তারকেও পাঠাতে পারে সন্তোষ পরীক্ষার ছলে,' বলল শায়লা।

'সন্তোষ লোকটা দেখছি মোটেই সন্তোষজনক নয়।' বিছানায় শুয়ে পড়ল রানা। কম্বল দিয়ে ঢেকে দিল শায়লা ওর গলা পর্যন্ত। 'উফ্! পিঠটা বিছানায় ঠেকিয়ে কী আরাম যে লাগছে! ইচ্ছে করছে একঘুমে চব্বিশ ঘণ্টা পার করে দিই।'

'চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে অনেক ধকল গেছে তোমার উপর দিয়ে। যাক্, এবার প্ল্যানটা বলো।'

'প্রথমে আমাদের সাদেক খানকে বের করে আনতে হবে ওয়ার্ড থেকে।'

'তাতে অসুবিধে হবে না। প্রথম দিকে কড়া পাহারার ব্যবস্থা ছিল। এখন ওর প্রয়োজনীয়তা প্রায় নিঃশেষ হয়েছে বলে গার্ড থাকে না সঙ্গে। আব্বাজীর যখন ইচ্ছে ওকে ল্যাবরেটরিতে আনতে পারেন পরীক্ষার জন্যে।'

'আজ রাতে ওকে আনা সম্ভব হবে?'

একটু চিন্তা করে বলল শায়লা, 'আনা যাবে। ওর খাবারের সঙ্গে একটু ওষুধ মিশিয়ে দেব যাতে পেট ব্যথা আরম্ভ হয়। ওয়ার্ড সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হয় আব্বাজীকে, নয় আমাকে ডেকে পাঠাবে। আমি ল্যাবরেটরির সার্জারিতে নিয়ে আসতে বলব ওকে। সাথে অবশ্য দু'জন মেল নার্স থাকবে, ওদেরকে ওয়ার্ডে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া যাবে।'

'বেশ। সার্জারিতে নিয়ে ঘুমের ওষুধ পুশ করে ঘুম পাড়িয়ে রাখবে তুমি ওকে। এবার দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে কম্পিউটারটা নষ্ট করে দেয়া। ওটা নষ্ট করে দিয়ে হেলিকপ্টারে করে চলে যাব আমরা নরসাপুর। এখন বলো, কম্পিউটার ধ্বংস করবার কি উপায়।'

'সেটা অসম্ভব,' মাথা নাড়ল শায়লা। 'মাটির তলায় একটা ঘরে রাখা হয়েছে সেটাকে। একটা মাত্র পথ আছে ওই ঘরে ঢুকবার- আর সেখানে চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দিচ্ছে ছয়জন গার্ড। ওখানে যেতে হলে দুটো পাস্ দরকার। তিনটে স্টীলের দরজা পেরিয়ে তারপর সেই ঘর। শেষের দরজাটায় চাবি লাগালেই চালু হয়ে যায় টেলিভিশন ক্যামেরা। কম্পিউটার নষ্ট করবার কোন উপায় নেই।'

‘ঘরটা কি রকম?’

‘কংক্রিটের দেয়াল। ফায়ারপ্রুফ। বোমা মারলেও ওর কোন ক্ষতি করা যাবে না।’ শায়লার হাতের ঘড়ির মধ্যে থেকে শব্দ এল পিপ্ পিপ্। উঠে দাঁড়াল সে। ‘আমাকে যেতে হবে এখন।’

‘যত শিগগির পারো ফিরে এসো।’

‘আসব। তোমার জন্যে খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি এক্ষুণি গিয়ে।’

‘যাবার আগে কম্পিউটার রুমের একটা মোটামুটি নক্সা এঁকে দিয়ে যাও। ঘরের কোন্‌খানটায় কিভাবে রাখা আছে ওটা দেখতে চাই আমি।’

দ্রুত কয়েকটা আঁচড় কেটে এঁকে দিল শায়লা নক্সা। বলল, ‘অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিং-এর নিচে এই কম্পিউটার রুম।’

‘চারকোণা ওই জিনিসটা কি আঁকলে?’

‘ভেণ্টিলেশন শ্যাফট্। ওই জায়গা দিয়ে বাইরের খোলা বাতাস টেনে আনা হয় ভিতরে।’

‘বাতাসটা কি ফিলটার্ড হয়ে আসে?’

‘না। এবার উঠতে হবে আমাকে। তুমি খেয়ে নিয়ে শুয়ে থাকো ঘুমের ভান করে।’

‘তাড়াতাড়ি এসো। আমাদের হাতে একমাত্র অস্ত্র সময়।’

বিশ মিনিট মন দিয়ে দেখল রানা শায়লার আঁকা নক্সাটা। বার কয়েক ভুরু কুঁচকাল, তারপর মৃদু হাসি ফুটে উঠল ওর মুখে। কাগজটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে বাথরুমে ফেলে চেন টেনে দিল সে। সমাধান হয়ে গেছে সমস্যার।

খাওয়া-দাওয়া সেরে নিল রানা বিছানায় শুয়েই। অর্ডারলি ট্রে-টা নিয়ে বেরিয়ে গেল। ভবিষ্যতের কথা ভেবে সত্যিই ভয় পেল রানা এবার। শায়লাকে এভাবে কথাটা দিয়ে কি ঠিক করল সে? এত বড় দায়িত্ব নিল সে মাথার ওপর, অথচ ক্ষমতা তার কতটুকু? একজন স্ত্রীলোক আর একজন পঙ্গ বৃদ্ধকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়ার অধিকার সে পেল কোত্থেকে? ওরই ভরসায় এত বড় ঝুঁকি নিচ্ছে ওরা- বাধা দেয়া কি উচিত ছিল না ওর? কিন্তু না নিয়েই বা উপায় কি? ওদেরকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ফেলে রেখে পালাবেই বা সে কি করে? তার চেয়ে চেষ্টা করে যদি সফল না হয় সেটাও বরং ভাল।

আস্তে করে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলেন ডক্টর ফৈয়াজ। বিছানার পাশে নিয়ে এলেন ওঁর হুইল চেয়ার।

স্পারলে কিছু প্ল্যান বের করতে?’ জিজ্ঞেস করলেন বৃদ্ধ।

‘আগে আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিন। কম্পিউটারটা আমরা যদি ধ্বংস করে দিয়ে যাই তাহলে ওরা কি আবার একটা বানাতে পারবে?’

‘মনে হয় না। ক্যালিব্রেশন চার্টে ভুল ফিগার বসিয়ে রেখেছি আমি।

আমাকে ছাড়া...'

'কবীর চৌধুরীকে যেসব চার্ট দিয়েছেন সেগুলো?'

'সেগুলো ঠিক আছে। কিন্তু সম্পূর্ণ নেই। শেষের অংশটুকু আমার কাছেই আছে।'

'ওকে ঠিক চার্টটা দিয়েছেন কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'কারণ ওকে ফাঁকি দেয়া সম্ভব ছিল না। এমন প্রতিভাবান লোক আমি খুব কমই দেখেছি। নিজে সে ফিজিক্সের লোক, অথচ প্রত্যেকটা সাবজেক্টে ওর অপরিসীম জ্ঞান। ওর চোখে ধুলো দেয়া কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। তাছাড়া ও আমাকে বলেছে, এই যন্ত্র তৈরি হলে পর ভারত যেন তার সাহায্যে নিজের হীন মনোবৃত্তি চরিতার্থ করতে না পারে সেদিকে সে নজর রাখবে। কম্পিউটার তৈরি হয়ে গেলে ওটা নষ্ট করে দিয়ে কেবল চার্টগুলো নিয়ে সে চলে যাবে ভারত থেকে। মানুষের বৃহত্তর কল্যাণের কাজে ব্যবহার করবে সে যন্ত্রটা।'

'ওর কথায় বিশ্বাস করেছেন আপনি?'

'বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্নই উঠতে পারে না, রানা। ওর কথামত কাজ না করে উপায় ছিল না আমার। অত্যন্ত ক্ষমতাশালী লোক ও এখানকার। কর্নেল বটব্যাল পর্যন্ত ওর ভয়ে থরহরিকম্প। ওর মুখের এক কথায় জেল থেকে ছেড়ে দিয়েছে আমাকে ভারত সরকার। ওরই উদ্ভাবিত পন্থায় রিসার্চ করেছি আমি। ওকে ভুল চার্ট ধরিয়ে দিয়ে গোঁজামিল দেয়া আমার সাধ্যের বাইরে ছিল। কিন্তু চিন্তা কোরো না। শেষের অংশটুকু লুকানো আছে আমার কাছে। আজই যদি পালিয়ে যেতে পারি আমরা, যন্ত্রটা তৈরি করা কারও পক্ষেই সম্ভব হবে না আর।'

'এই কম্পিউটারটা নষ্ট হয়ে গেলে এবং সাদেক খান বা আপনি হাত ছাড়া হয়ে গেলে আরেকটা মেশিন তৈরি করতে পারবে না ওরা?'

'না। কিন্তু কম্পিউটার নষ্ট করা সহজ হবে না।'

'আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে। আপনাদের ল্যাবরেটরিতে নিশ্চয়ই ডাই-এথিল ইথার আছে?'

'আছে। কিন্তু ওটা দিয়ে কি হবে?' আশ্চর্য হলেন বদ্ধ।

'ধরুন, ভেন্টিলেটার গ্রিল দিয়ে যদি ছাড়ি ওটা ঘরের মধ্যে?'

বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন বদ্ধ রানার মুখের দিকে। তারপর ধীরে ধীরে হাসি ফুটে উঠল ওঁর নির্যাতিত শীর্ণ মুখে।

'বুঝেছি! তুমি জানলে কি করে? বাতাসের সঙ্গে মিশলে ভয়ঙ্কর জিনিস হয়ে দাঁড়ায় ডাই-এথিল ইথার। শ্যাফট দিয়ে যদি ঘরের মধ্যে ফেলা যায় তাহলে বাতাসের সঙ্গে মিশে পুরো ঘরটাই একটা ভয়ঙ্কর বোমায় পরিণত হবে। একটু আগুন বা স্ফুলিঙ্গ পেলেই ফাটবে সেই বোমা। ঠিক বলেছ।

আমেরিকার একটা ছয়তলা গবেষণাগার এই রকম একটা অ্যাক্সিডেন্টে ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল ফিফটি সিক্সে। কিন্তু ডিটোনেট করবে কি করে, আগুন পাবে কোথায়?'

'আগুনের ব্যবস্থা আপনাকে করতে হবে। কম্পিউটারটায় কোথাও শর্ট সার্কিট করে দিয়ে স্পার্কের ব্যবস্থা করা যায় না?'

'আজ রাতেই কি ফাটাতে চাও?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। ভুরু কুঁচকে চিন্তা করলেন বৃদ্ধ কিছুক্ষণ, তারপর বললেন, 'কঠিন হবে। রাত ন'টার পরই করিডরের মেইন সুইচ-বোর্ড থেকে ওই ঘরের কানেকশন অফ করে দেয়া হয়। তাতে অবশ্য অসুবিধে হবে না। ইমার্জেন্সী জেনারেটার আছে এখানে। যদি কোনও কারণে মেইন সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে চালু হয়ে যায় ইমার্জেন্সী জেনারেটার। অটোমেটিক। কয়েকটা জরুরী জায়গায় আপনা-আপনি ইমার্জেন্সী কারেন্ট চালু হয়ে যায়। যেমন ধরো, অপারেশন থিয়েটার, ল্যাবরেটরি, ইলেকট্রনিক্স্ রূম, দেয়ালের ওপাশের ফ্লাড লাইট এবং ভয়ঙ্কর ওয়ার্ডগুলোতে মেইন জেনারেটার বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ইমার্জেন্সী জেনারেটার এসে টেক-ওভার করে। কিন্তু অন্যান্য সমস্ত জায়গায় একটা প্লাগ মেইন পয়েন্ট থেকে খুলে ইমার্জেন্সী পয়েন্টে লাগালে পরে সাপ্লাই পেতে পারে। আমি এক কাজ করব। কোন এক ছুতোয় ওই ঘরে ঢুকব আজ। কোন একটা ছোট-খাট সাধারণ ইলেকট্রিক যন্ত্রে শর্ট সার্কিট করে দিয়ে ওটা ইমার্জেন্সী লাইনে প্লাগ লাগিয়ে রেখে আসব। ওরা যখন করিডরের মেইন সুইচটা অফ করে দেবে ইমার্জেন্সী লাইনটা খোলাই থাকবে। তুমি যদি কোন কৌশলে মেইন পাওয়ার লাইনটা ফিউজ করে দিতে পার, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে চালু হয়ে যাবে ইমার্জেন্সী জেনারেটার।'

'এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে স্পার্ক হবে। এই তো?' হেসে ফেলল রানা বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিকের পেটে-পেটে বত্রিশ প্যাঁচ দেখে। ডক্টর ফৈয়াজও হাসলেন তাঁর শিশুসুলভ হাসি। 'কিন্তু মেইন লাইনটা ফিউজ করতে কি বিশেষ বেগ পেতে হবে?'

'মোটেও না,' বললেন বৈজ্ঞানিক। 'আমি সহজ কৌশল বাতলে দেব। আমাদের এই প্ল্যানের আরও একটা সুবিধা আছে। কম্পিউটার রূমটা ঠিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ব্লকের নিচে। ওটার মধ্যে যদি বোমা ফাটাও, এই দ্বীপের টেলিফোন আর রেডিও লিঙ্ক বিধ্বস্ত হয়ে যাচ্ছে সাথে সাথে।'

চলে গেলেন বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক। বিছানায় চিৎ হয়ে শবাসনে শুয়ে মন থেকে সমস্ত চিন্তা আর উদ্বেগ দূর করে দিল রানা। সমস্ত দেহ ঢিল করে দিয়ে বিশ্রাম নিল সে দশ মিনিট। তার সমস্ত শক্তি আর বুদ্ধি কাজে লাগবে আজ রাতে- বিশ্রাম দরকার।

ঠিক সাড়ে আটটার সময় এল শায়লা।

'আমাকে এখুনি যেতে হবে। কয়েকটা খবর দিতে এলাম, আব্বা খান্নাকে বলেছেন তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছেন বারো ঘণ্টার জন্যে।' রানার মাথার কাছে বিছানার ধারে বসে পড়ল শায়লা। হাত চালিয়ে দিল চুলের মধ্যে।

'আর সব ব্যবস্থা ঠিক আছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ভাল খারাপ দুই রকম খবরই আছে। সাদেক খানের ব্যাপারে গোলমাল হবে না কিছু। কবীর চৌধুরীর গাড়িটা যখন খুশি ব্যবহার করবার জন্যে অনুরোধ করে গেছে সে আব্বাজীকে। সবাইকে বলে দিয়ে গেছে যেন কেউ কোনও বাধা সৃষ্টি না করে। গত কয়েকদিন যাবত আমরা প্রায়ই সে গাড়িতে করে সারাদিনের খাটুনির পর হাওয়া খেতে যাচ্ছি।

'কে চালাচ্ছে?'

'আমিই। সার্জারির সামনে এনে রেখে দিয়েছি আমি গাড়িটা। ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে সাদেক খানকে কম্বল মুড়ে তুলে দেব গাড়ির পিছনে। গাড়ি নিয়ে আজও যদি হাওয়া খেতে যাই, কারও কোন সন্দেহ করবার কারণ নেই।'

'গুড। কম্পিউটার রূমের ব্যাপারটা কতদূর?'

'আব্বাজী এখন কাজ করছেন ওখানে। কপাল ভাল, সন্তোষ মুখার্জী আবার সন্ধ্যার দিকে কি একটা জরুরী ব্যাপারে হায়দ্রাবাদ চলে গেছে।'

'চমৎকার! একমাত্র ওর ভয়ই করছিলাম আমি। তোমার আব্বার সঙ্গে কম্পিউটার রূমে ওই ব্যাটা ঢুকে পড়লে অসুবিধে হত।'

'আর দুঃসংবাদ হচ্ছে- হেলিকপ্টারে করে গেছে সে। ওটা ব্যবহার করতে পারছি না আমরা।'

একটু দমে গেল রানা কিন্তু সে-ভাবটা প্রকাশ করল না সে। শুধু শুধু মেয়েটাকে ঘাবড়ে দেয়ার কোন মানে হয় না। বলল, 'ওটা পেলে সুবিধা হত অনেক। কিন্তু কি আর করা। এই দ্বীপ থেকে পালাবার আর কি রাস্তা আছে?'

'লঞ্চ আছে দুটো, আর একটা স্পীড বোট। বড় লঞ্চটায় করে খাবারদাবার, বাজার-মাছ-ডিম ইত্যাদি আসে। ছোট লঞ্চ আর স্পীড বোটে করে পাহারা দেয়া হয় দ্বীপের চারপাশ।'

'গার্ড আছে?'

'ঠিক বলতে পারব না। রাতের বেলা ওদিকে যাইনি কখনও।'

'ঠিক আছে। গার্ড যদি থাকে তাহলে তার কপাল খারাপ বলতে হবে,' বলল রানা। 'কিন্তু বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত গার্ড ছুটবে ল্যাবরেটরির

দিকে। তার আগেই এরিয়া থেকে বেরিয়ে যেতে হবে তোমাদের। নইলে আটকা পড়ে যাবে ওদের মধ্যে। আমি তোমাদের সাথে দেখা করব জেটির কাছে। এখন আমার দরকার কিছু কালো জামা-কাপড়।'

'ওসব জোগাড় করে রেখেছে আব্বাজী। এমন কি একটা মেল নার্সের সীলমোহর করা আইডেন্টিটি কার্ড পর্যন্ত।'

'ইথারের ব্যবস্থা হয়েছে?'

'আমি একটু আগে একটা ড্রাম আর কিছু পাইপ রেখে এসেছি ক্লিনিকের সাত নম্বর ওয়ার্ডের পেছনে একটা ঝোপের মধ্যে। ইথারটা আস্তে আস্তে ছেড়ো যাতে ভেপোরাইজড হতে সময় না নেয়।'

'দরজার ফাঁক দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে বাইরে বেরোবে না তো? তাহলে গার্ডগুলো...'

'না। কামরাটা এয়ারটাইট। এবার চলি আমি। ঠিক সাড়ে দশটার সময় বেরোবে তুমি এই ঘর থেকে। প্যাসেজের শেষ মাথায় জানালাটার গরাদ নেই। জানালার পাশেই পানি তুলবার পাইপ পাবে। ওটা বেয়ে অনায়াসে নেমে যেতে পারবে নিচে। সাড়ে দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে কোন গার্ড থাকে না ওখানে। খুব সাবধান, রানা! আমাদের কাজগুলো আমরা করছি- কিন্তু সবকিছু নির্ভর করছে এখন তোমার ওপর। চলি।' হঠাৎ রানার কপালে চুমো খেলো শায়লা। মাথাটা বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে থাকল কয়েক সেকেণ্ড, তারপর ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। 'আব্বা কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না আমাদের সঙ্গে যেতে, পাছে আমাদের কাঁধের বোঝা হয়ে দাঁড়ান সেই ভেবে- সেজন্যে তখন তোমাদের সঙ্গে ওই রকম অভিনয় করতে হয়েছিল। রাগ করোনি তো, রানা?'

'না।'

চলে গেল শায়লা। ঠিক সোয়া-দশটায় প্রেতাত্মার মত নিঃশব্দে হুইল চেয়ারের চাকা ঘুরিয়ে ঘরে ঢুকলেন ডক্টর আবদুল্লাহ্ ফৈয়াজ। চোখ বন্ধ করে পড়ে ছিল রানা। হঠাৎ চোখ খুলতেই দেখল একাগ্র দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে বসে আছেন বদ্ধ বৈজ্ঞানিক।

'সব ঠিক আছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'সাদেক খানকে গাড়িতে তুলে নেয়া হয়েছে।'

'ও যে খোয়া গেছে সেটা কতক্ষণে বুঝতে পারবে এরা?'

'বুঝতে পারবে না। নয়টার সময় শিফট্ চেঞ্জ হয় নার্সদের। একজন মহিলা নার্সকে হঠাৎ আক্রমণ করে খুন করায় রাতে ওর ওয়ার্ডে কেউ যায় না। ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয় বলে যাবার দরকারও পড়ে না।'

'কখন রওনা হচ্ছেন আপনারা?'

'এখান থেকে নিচে নেমেই। ঘণ্টা খানেক কোন খোঁজ পড়বে না আমাদের।'

‘আপনাদের অনুসরণ করবে না তো কেউ?’

‘না। কম্পিউটার রূমের একটা ইলেকট্রিক ড্রিলিং মেশিন শর্ট সার্কিট করে রেখে ইমার্জেন্সী লাইনে প্লাগ লাগিয়ে দিয়ে এসেছি। যেই ইমার্জেন্সী জেনারেটার চালু হবে অমনি স্পার্ক হবে একটা। আর এই জিনিসটা দিয়ে,’ কাপড়ের ভিতর থেকে একটা পুঁটুলি বের করলেন বদ্ধ, ‘মেইন লাইন ফিউজ করে দিতে পারবে।’

একটা নাইলন কর্ডের রীল। সুতোর একমাথায় তামার একটা রড বাঁধা। পিঠের কাছ থেকে একটা কালো পুলওভার আর গাঢ় ছাই রঙের প্যাণ্ট বের করে দিলেন বদ্ধ। শীর্ণহাতে রানার হাত ধরে বললেন, ‘খোদা তোমার সহায় হোন।’

বেরিয়ে গেলেন ডক্টর ফৈয়াজ।

দশ মিনিটের মধ্যে বিছানা ছেড়ে উঠে তৈরি হয়ে নিল রানা। ঠিক সাড়ে দশটায় দরজা দিয়ে বাইরে মুখ বাড়িয়ে করিডরটা দেখল সে। ফাঁকা। নিঃশব্দ পায়ে চলে এল শেষ মাথার কাছে। নেমে এল পাইপ বেয়ে।

প্রেতাত্মার মত মিশে গেল সে অন্ধকারে।

ড্রাম খালি হতেই কলের মুখ থেকে রাবারের পাইপটা খুলে ভেন্টিলেটার গ্রিলের ভিতর ঢুকিয়ে দিল রানা। কোল থেকে নামিয়ে দিল ড্রামটা। এবার পাওয়ার হাউসের দিকে যেতে হবে। আবার বুকে হেঁটে এগোল রানা। দুশো গজ দূরে পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন প্ল্যান্ট। তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। কিন্তু আসলে ওর মধ্যে কোন প্রয়োজন নেই রানার। যতটা সম্ভব দূরে সরে যেতে চায় সে কম্পিউটার রূম থেকে।

সাবধানে এগোল রানা চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি ফেলে। কিন্তু সার্চলাইটের ভয় সর্বক্ষণ রয়েই যাচ্ছে। কোন নির্দিষ্ট গতিতে বা নির্দিষ্ট পথ ধরে ঘুরছে না আলোটা। যে-কোন জায়গায় যে-কোন সময় দপ করে জ্বলে উঠতে পারে সার্চলাইট। এখন এই অবস্থায় ধরা পড়ে গেলে সব শেষ হয়ে যাবে।

পাওয়ার হাউসের দশ গজের মধ্যে চলে এল রানা। হাই টেনশন তারগুলোর নিচে এসে পড়েছে সে। শুয়ে শুয়েই রীল থেকে বেশ খানিকটা সুতো বের করল রানা তামার রডটা হাতে ধরে রেখে। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে ছুঁড়ে দিল রীলটা ওপর দিকে। তারগুলোর ওপর দিয়ে গিয়ে মাটিতে পড়ল সেটা। সন্তর্পণে চাইল রানা চারপাশে। হামাগুড়ি দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে মাটি থেকে কুড়িয়ে নিল সে রীলটা, তামার রড ওখানেই ফেলে রেখে। হাতে গ্লাভস্ পরে নিল এবার। সুতো ধরে ধীরে ধীরে টান দিতেই দুলতে দুলতে উঠতে আরম্ভ করল তামার রড ওপর দিকে। আর খানিকটা বাকি আছে তারের কাছে পৌঁছতে।

হঠাৎ একটা প্রচণ্ড গগন-বিদারী চিৎকার শুনে হাত থেকে ছুটে যাচ্ছিল রানার সুতোটা। চেয়ে দেখল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ব্লকের দিক থেকে ছুটে আসছে ওর দিকে দুইজন গার্ড। পরমুহূর্তেই দপ করে জ্বলে উঠল সার্চলাইট। দিনের মত পরিষ্কার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে গেল জায়গাটা। সুতো ধরে দাঁড়িয়ে আছে রানা। ছুটে আসছে গার্ড দু'জন।

জোরে টান দিল রানা সুতো ধরে। তামার রডটা দুটো তার স্পর্শ করতেই কড়াৎ করে শব্দ হলো একটা, নীলচে-সাদা আলো জ্বলে উঠল তারে। যেমন জ্বলে উঠেছিল তেমনি দপ করে নিভে গেল সার্চলাইট। পরমুহূর্তে ম্লানভাবে জ্বলে উঠল আবার ইমার্জেন্সী জেনারেটার চালু হতেই।

কেঁপে উঠল দ্বীপটা। ভূমিকম্প হচ্ছে যেন। চুরমার হয়ে আকাশের দিকে উঠে গেল গোটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ব্লক। হুমমুড় করে একটা অংশ পড়ল গার্ড দু'জনের ওপর। মিশে গেল ওরা মাটির সাথে। প্রাণপণে ছুটল রানা মেইন গেটের দিকে। অন্ধকার একটা জায়গায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল পাঁচ মিনিট।

হৈ-চৈ হুলস্থূল পড়ে গেছে চারদিকে। ব্যারাক থেকে ছুটে আসছে একদল সৈন্য। সাইরেন বাজাতে বাজাতে এগিয়ে আসছে ট্রাক, জীপ। দমকলের ঘণ্টাও শুনতে পেল রানা।

মেইন গেটটা হাঁ করে খোলা। অন্ধকারে ভিড়ের হট্টগোলের মধ্যে দিয়ে নিরাপদে বেরিয়ে এল রানা বাইরে। রাস্তার ঠিক মাঝখান দিয়ে দৌড় দিল জেটির দিকে। গাড়িটা দেখতে পেল সে জেটির কাছে। ছুটে এল শায়লা।

'তোমার কোথাও লাগেনি তো?'

'না।'

'জেটিতে স্পীড বোটটা আছে রানা। ওটা স্টার্ট দেয়ার জোগাড় করেছিল ওরা, কিন্তু বিস্ফোরণের শব্দ শুনে দৌড়ে চলে গেছে ল্যাবরেটরির দিকে।'

'বেশ। সাদেক খানকে এই বোটে তুলে ফেল টেনে-টুনে। আমি আসছি এক্ষুণি।'

'কোথায় যাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল শায়লা।

'ওই যে লঞ্চটা দাঁড়িয়ে আছে ওটাকে খতম করে দেব। তাহলে সঙ্গে সঙ্গে পিছু নিতে পারবে না ওরা।' কথাটা শেষ হবার আগেই ছুটে চলে গেল রানা।

ডিস্ট্রিবিউটারটা টেনে ছিঁড়ে পানিতে ফেলে দিল সে। তারপর একখানা হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে দুটো বড় গর্ত সৃষ্টি করল পেট্রল ট্যাঙ্কের গায়ে। ফিরে আসবার আগে লঞ্চের ডেকের ওপর থেকে দেয়াল ঘেরা এলাকাটার দিকে একবার চাইল রানা। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে সেখানে।

লাফিয়ে নিচে নামল রানা। দৌড়ে চলে এল স্পীড বোটের কাছে। সাদেক খানকে বোটে ওঠাবার চেষ্টা করছে শায়লা। ডক্টর ফৈয়াজ সাহায্য করবার চেষ্টা করছেন সাধ্যমত। রানা পায়ের দিকটা ধরল। সাদেক খানকে উঠিয়ে ডক্টর ফৈয়াজকে কোলে তুলে নিল রানা, যত্নের সঙ্গে বসিয়ে দিল বোটের মাঝখানে। হুইল চেয়ারটা ভাঁজ করে রানার হাতে দিল শায়লা।

'একটা জিনিস রয়ে গেছে গাড়িতে,' ছুটল শায়লা।

'জলদি এসো,' বলেই স্টার্টার বাটন্ টিপে দিল রানা। গর্জন করে উঠল এইটিন হর্স পাওয়ার এভিনরুড এঞ্জিন। অল্পক্ষণেই একটা মেডিকেল কিট আর খাবারের প্যাকেট নিয়ে ফিরে এল শায়লা। 'গুড, দরকার হতে পারে,' বলল রানা উৎসাহিত কণ্ঠে।

শায়লা উঠে বসতেই রশি খুলে দিয়ে বোট ছেড়ে দিল রানা। সোজা পশ্চিম দিকে চলল বোট আঁধার কেটে। চুপচাপ কয়েক সেকেণ্ড মুক্তির আনন্দ উপভোগ করল ওরা। হেসে উঠল শায়লা। 'আম্বালার সেই মড়ার খাটিয়ায় করে পালাবার কথা মনে পড়ছে। কোন্‌দিকে চলেছি আমরা, রানা?'

'ইলোর। বোটটা পানিতে ডুবিয়ে রেখে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলে যাব ছ'মাইল। ইলোর পৌঁছে কারও গাড়ি চুরি করে যেতে হবে আমাদের রাজামুন্দ্রি। ওখান থেকে জেলে নৌকায় করে মাছ ধরতে ধরতে গোদাবরী নদী বেয়ে চলে যাব নরসাপুর। ভোরের আগে রাজামুন্দ্রিতে পৌঁছতে পারলে হয়তো ওদের চোখে ধুলো দেয়া সম্ভব হতে পারে।'

অনেকক্ষণ কাটল চুপচাপ। ছ'মাইল দূরে চলে এসেছে স্পীড বোট দ্বীপ থেকে। 'আর মাইল খানেক গেলেই পৌঁছে যাবে ঘাটে। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় জিজ্ঞেস করল রানা, 'দ্বীপের মধ্যে আগুন দেখে কি বাইরে থেকে সাহায্য করতে আসবে লোকজন?'

'না। নিষিদ্ধ এলাকা ওটা। এমন কি ইলোরের পুলিস পর্যন্ত কাছে এগোবার সাহস পাবে না অনুমতি ছাড়া। রেডিও মারফত আগে অনুমতি নিতে হবে,' বললেন ডক্টর ফৈয়াজ।

'রেডিও রুমের যে অবস্থা হয়েছে তাতে সে সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না,' হাসল রানা। আত্মবিশ্বাস ফিরে আসছে ওর। খুশি হয়ে উঠছে সে নিজের ওপর।

ঠিক এমনি সময় তিনজনই একসাথে চম্‌কে উঠে চাইল ওরা আকাশের দিকে। এঞ্জিনের শব্দ। পুরু মেঘ জমেছে আকাশে। একটা জায়গা শুধু অপেক্ষাকৃত ফর্সা দেখাচ্ছে কৃষ্ণপক্ষের ম্লান চাঁদের আলোয়। ঠিক সেইখানেই দেখা গেল হেলিকপ্টারটা। দ্বীপের দিক থেকে সোজা এগিয়ে আসছে স্পীড বোটের দিকে।

সাত

'সন্তোষ না নিয়ে গিয়েছিল হেলিকপ্টারটা?' বলল রানা থ্রট্‌ল্‌টা পুরো খুলে দিয়ে। যে করে হোক ঘাটে পৌঁছতে হবে এখন। বিপদটা টের পেয়ে গেছে সে পুরোপুরি।

'এটা ক্লিনিকের সেই হেলিকপ্টার না,' বলল শায়লা দ্রুত অগ্রসরমান কপ্টারের দিকে চেয়ে। 'আগে কখনও দেখিনি এটা। খুব সম্ভব গোপনে রাখা ছিল মিলিটারি এলাকায়।'

নেমে এল হেলিকপ্টার অনেকখানি নিচে। টুপ করে পানিতে পড়ল গোলমত কি যেন বোটের কয়েক গজ সামনে।

'শুয়ে পড়ো!' চিৎকার করে উঠল রানা। 'শুয়ে পড়ো সবাই!'

কয়েক গজ সামনে ফাটল হ্যাণ্ড গ্রেনেড ওদের সবাইকে চুপচুপে করে ভিজিয়ে দিয়ে। এবার গুলি বর্ষণ শুরু করল হেলিকপ্টারের মেশিনগান।

ডানদিকে কাটল রানা। কাৎ হয়ে গেল স্পীড বোট, পানির ছিটে এসে লাগল সবার চোখে-মুখে। ঠক্ ঠক্ শব্দ করে কাঠ চিরে ঢুকে গেল বোটের মধ্যে কয়েকটা বুলেট। আরও নেমে এসেছে হেলিকপ্টার। পানি ছুঁই ছুঁই করছে চাকাগুলো। সামনের দিক থেকে এগিয়ে আসছে সেটা এবার।

সামান্য বাঁয়ে কেটে সোজা হেলিকপ্টারের দিকে চালিয়ে দিল রানা স্পীড বোট। তেড়ে আসছে স্পীড বোট আর হেলিকপ্টার পরস্পরের দিকে। কেউ হটবার পাত্র নয়। কার স্নায়ুতে কত জোর যেন পরীক্ষা হবে এবার। রানা হিসেব করে দেখেছে দুটোতে ধাক্কা লাগলে জয়ী হবে স্পীড বোটই। তাছাড়া মেশিনগানের গুলি থেকে বাঁচতে হলে কাছাকাছি থাকতে হবে হেলিকপ্টারের। কো-পাইলট গুলি চালাচ্ছে ঠিকই কিন্তু অ্যাঙ্গেলে পাচ্ছে না আর ওদের, কয়েক ফুট পিছনে পানিতে পড়ছে সব গুলি।

নিজের অসুবিধার কথা টের পেল পাইলট। এই অবস্থায় ধাক্কা খেলে বোটের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি হবে হেলিকপ্টারের। ফুট ছয়েক থাকতেই রণে ভঙ্গ দিল সে। উঠে গেল কয়েক হাত উপরে। সাঁ করে বেরিয়ে গেল স্পীড বোট হেলিকপ্টারের তলা দিয়ে একরাশ পাখার বাতাস খেয়ে।

আবার ডান দিকে কাটল রানা। সোজা এগোচ্ছে সে তীরের দিকে। আবছা মত ঝোপঝাড় দেখা যাচ্ছে তীরে। কপ্টারও চলেছে সাথে সাথে।

আক্রমণের চেষ্টা করছে না সেটা আর। খুব সম্ভব রেডিও মারফত ওদের পজিশন জানাচ্ছে অন্যদের।

'রানা, পানি উঠছে বোটে,' বলল শায়লা।

'গর্তটা খুঁজে বের করে বন্ধ করবার চেষ্টা করো,' হুকুম দিল রানা।

'একটু বাঁয়ে একটা খালের মুখ দেখা যাচ্ছে, রানা। দুই পাশে জঙ্গল,' বলল শায়লা একটু পরে। ভয়ানক ভয় পেয়েছে সে। কিংবা পানিতে ভিজে শীতে কাঁপছে।

'ওই দিকেই যাব। আগে তীরের কাছে গিয়ে নিই,' উত্তর দিল রানা। স্পানি বন্ধ হয়েছে?'

'কমেছে, একেবারে বন্ধ হয়নি। দুটো ফুটো।'

পারের কাছাকাছি এসে গাছের ছায়ায় ছায়ায় এগোল রানা বাঁয়ে। কিন্তু ঠিক যখন খালের মুখে ঢুকে পড়বে সেই সময় হঠাৎ আঙুল তুলে দেখালেন ডক্টর ফৈয়াজ। 'ওই দেখো, লঞ্চ আসছে।'

তেতো হয়ে গেল রানার মনটা। ইচ্ছে করছিল না, তবু পিছন ফিরে দেখল সে। মাইলখানেকও হবে না। দোয়াতের কালির মত কালো পানির ওপর সাদা ঢেউ তুলে এগিয়ে আসছে একটা লঞ্চ।

ঢুকে পড়ল রানা সরু খাল দিয়ে। স্পীড কমিয়ে দিল। খালের দুই ধারে উঁচু তীর। প্রকাণ্ড সব গাছ-পালা খালের দুই তীরে গজিয়ে উঠে আকাশে গিয়ে পরস্পরের সাথে মিশেছে। তলায় নিকষ কালো অন্ধকার। রানা বুঝল বেশি দূরে যাওয়া যাবে না। কিন্তু যতদূর যাওয়া যাবে ততই লাভ। লঞ্চ আসতে পারবে না ভিতরে। স্পীড বোটের তলাই মাঝে মাঝে হালকাভাবে স্পর্শ করছে নিচের মাটি।

আধ মাইল এসে ঘ্যাশ্‌শ্‌ করে থেমে গেল স্পীড বোট। আর যাবে না। সাদেক খানকে নামানো হলো আগে, তারপর কোলে করে নামিয়ে আনল রানা ডক্টর ফৈয়াজকে- একহাতে ঝুলিয়ে নিল ওঁর হুইলচেয়ার। তারপর নামল শায়লা ওর খাবার আর ওষুধের বাক্স নিয়ে। এবার টেনে একটু গভীর পানিতে নিয়ে গেল রানা বোটটাকে। এমনিতেই পানি খেয়ে ঢোল হয়ে গেছে ওটার পেট, আধ মিনিট এদিক-ওদিক দোলাতেই তলিয়ে গেল নিচে।

হুড লাগানো পেন্সিল টর্চ জ্বেলে অল্পক্ষণ খোঁজাখুঁজির পরই একটা সরু পথ পেল রানা। উঁচু-নিচু পাহাড়ী পথ, কিন্তু অমসৃণ নয়। বেশ কিছুদূর হাঁটবার পর দেখতে পেল সে গুহাটা। খালের ধারে ফিরে এসে একে একে সাদেক খান এবং ডক্টর ফৈয়াজকে নিয়ে এল সে পাহাড়ী পথটার ওপর। ডক্টর ফৈয়াজকে হুইল-চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে সাদেক খানকে তুলে নিল পিঠে। ঘুমন্ত অবস্থায় দ্বিগুণ ওজন হয়ে যায় মানুষের। ধীরে ধীরে এগোল ওরা গুহাটার দিকে। আগে আগে টর্চ হাতে চলল শায়লা।

গুহায় পৌঁছে সাদেক খানকে পিঠের ওপর থেকে নামিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল রানা। বলল, 'বাব্বাহ্, জগদ্দল পাথর! এইটাকে সজ্ঞানে হাঁটিয়ে নেয়া যায় না?'

'জ্ঞান ফিরতে ওর আরও দুই ঘণ্টা,' বললেন ডক্টর ফৈয়াজ।

'দেখি, ভজিয়ে ভাজিয়ে যদি হাঁটাতে পারি তাহলে বেঁচে যাই। যদি হঠাৎ খেপে ওঠে, সামলানো যাবে তো? ওষুধ আছে সঙ্গে?'

'তা আছে,' বলল শায়লা। 'ওর পাগলামি শুরু হবার কয়েকটা সিম্টম্ আছে। টের পেলেই ঠাণ্ডা করে দেয়া যাবে।'

'কিন্তু ঘণ্টা দুই অপেক্ষা করব, না এখুনি রওনা হয়ে যাব ভাবছি। আজ রাতে পৌঁছতেই হবে ইলোরে। এখানে বসে থাকলে ধরা পড়ে যেতে পারি। লঞ্চ থেকে সৈন্য নামানো হবে ডাঙায়, সার্চ আরম্ভ হয়ে যাবে আজই রাতে। খুব বেশিদূর যে যেতে পারব না আমরা তা ওরা ভাল করেই জানে। তার ওপর নিরস্ত্র আমরা তিনজনই,' যেন নিজের সাথেই কথা বলছে এমনিভাবে বলে চলল রানা। 'কিন্তু ছয় মাইল ওকে পিঠে নিয়ে হাঁটা অসম্ভব। কাজেই দেরি...আচ্ছা! কোন ওষুধ দিয়ে, ওর জ্ঞান ফিরিয়ে আনা যায় না?'

'যায়। কিন্তু তার দরকার হবে না। বড় বড় হাই তুলছে, অল্পক্ষণেই জেগে যাবে ও। খুব সম্ভব পানিতে ভিজে ওষুধের প্রভাবটা কেটে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি।'

কিন্তু বিশ মিনিটের মধ্যে ভাঙল না সাদেক খানের ঘুম। ভিতর ভিতর অস্থির হয়ে উঠল রানা। ভারতীয় সৈন্যগুলো এই গুহা থেকে আর কতদূরে আছে কে জানে? ওরা কোন্ দিকটা আগে খুঁজবে? ওরা কি আন্দাজ করে নেবে যে ইলোরের দিকেই যাবে রানারা?

রানার অস্থিরতা বুঝতে পেরে সিরিঞ্জ বের করল শায়লা ওর মেডিকেল কিট থেকে। তারপর একটা কর্ক আঁটা গ্লাস টিউব থেকে সামান্য ওষুধ নিয়ে ঢুকিয়ে দিল সাদেক খানের হাতে। দশ সেকেণ্ডের মধ্যে আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসল সাদেক খান।

'কোথায় আমি!' এদিক-ওদিক চাইল সে। রানার দিকে চাইল সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে। 'কে আপনি? কোথায় নিয়ে এসেছেন আমাকে?'

'আমার নাম মাসুদ রানা। পাকিস্তানী স্পাই। আমি পাকিস্তান থেকে এসেছি আপনাকে এই পাগলা গারদ থেকে মুক্ত করে নিয়ে যেতে। আপনাকে বন্দী করে নিয়ে এসেছিল ওরা এইখানে।'

'না, আমাকে বন্দী করে আনবে কেন? আমাকে বিক্রি করে দিয়েছে পাকিস্তান এদের কাছে।'

স্পাকিস্তান মস্ত ভুল করেছিল। সেজন্যে অনুতপ্ত হয়ে পাঠিয়েছে আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে,' কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল রানা।

'ফিরিয়ে নিয়ে কি করবে? হেমায়েতপুর পাগলা গারদে পাঠাবে তো? আমি যাব না।' ডক্টর ফৈয়াজের দিকে চোখ পড়তেই বলল, 'এই ল্যাংড়া এখানে কেন? ওকেও কি বিক্রি করে দিয়েছিল পাকিস্তান?'

'না। উনি ভারতীয়। আমাদের সাহায্য করছেন পালিয়ে যাবার ব্যাপারে। আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে কয়েকজন গার্ড- যে-কোন মুহূর্তে ওরা এসে পড়তে পারে এখানে- আর তো দেরি করা ঠিক হবে না। ধরা পড়লে আমাদের সবাইকে গুলি করে খুন করবে ওরা।'

'আমাকে মারবে না,' বলল সাদেক খান সবজান্তার হাসি হেসে। 'আমি মহা-মূল্যবান সম্পদ ওদের। আমি পালাতে যাব কোন্ দুঃখে? আমার ব্রেনের সাহায্য নিয়ে ওরা একটা কম্পিউটার তৈরি করছে। আমাকে কিছুতেই...'

'বোকার মত কথা বলছেন আপনি,' রানা বুঝল একে ভয় না দেখালে কাজ উদ্ধার হবে না। 'কম্পিউটারটা ধ্বংস করে দিয়েছি আমি। যে বৈজ্ঞানিকের সাহায্যে ওই কম্পিউটার তৈরি করা হচ্ছিল সেই ডক্টর ফৈয়াজ চলেছেন আমাদের সঙ্গে। কাজেই শুধু শুধু আপনাকে কোলে বসিয়ে সকাল-বিকেল চুমু খাবে না ভারত সরকার। আপনার এক কানাকড়িও মূল্য নেই এখন ওদের কাছে। এলে আসতে পারেন, নইলে চললাম আমরা। আপনাকে দেখতে পেলেই কুকুরের মত গুলি করে মারবে ওরা এখন।'

এবার সত্যিই ভয় পেল সাদেক খান। কয়েক সেকেণ্ড স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল মাটির দিকে, তারপর তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল।

'আসছে ওরা!' ফ্যাঁশফেঁশে কণ্ঠে বলল সাদেক খান। 'ক্যাপ্টেন খান্না এইমাত্র বলল, "নিশ্চয়ই গুহার মধ্যে পাবে ওদের, ওরা ভাববে খুঁজে পাব না আমরা। বাধা দিলে গুলি চালাবে।"- পালান সাহেব। আসছে ওরা!' রানার কাছাকাছি সরে এল সে ভয়ে ভয়ে। 'ঠিকই বলেছেন আপনি। আমার আর কানাকড়িও মূল্য নেই ওদের কাছে। কাল রাতেই বিষ খাইয়ে খুন করতে চেয়েছিল ওরা আমাকে। আপনি বাঁচান আমাকে, মিস্টার!'

'কোন ভয় নেই আপনার। আমার কথামত চললে এক সপ্তাহের মধ্যে ঢাকায় ফিরে রেক্সের পরোটা-কাবাব খাওয়াব। নিন, চলুন, ওই পোঁটলাটা তুলে নিন মাথার ওপর।'

দুই ঘণ্টা একটানা চলার পর জঙ্গলের শেষ প্রান্তে পাকা সড়কের কাছাকাছি পৌঁছে গেল ওরা। ভোর হয়ে আসছে। ইলোর আর আধ মাইল। মেডিকেল কিট্টা মাটিতে নামিয়ে তার পাশে বসে পড়ল রানা। কপালের ঘাম মুছে বলল, 'বসে পড়ো, শায়লা। বসুন, সাদেক সাহেব। পাঁচ মিনিট রেস্ট। দেখুন তো, সাদেক সাহেব, গার্ডরা এখন কি ভাবছে?'

'ওরা আশেপাশে অনেকটা জায়গা খুঁজেছে আমাদেরকে গুহায় না পেয়ে। তারপর ফিরে যাচ্ছে ক্যাপ্টেনের কাছে রিপোর্ট করতে। ও আমি

হাঁটতে হাঁটতেই টের পেয়েছি অনেকক্ষণ আগে।'

'বাহ্, চমৎকার! এবার আমি বেরোব একটা গাড়ির খোঁজে। আপনারা বিশ্রাম...'

'না না, গাড়ি না,' হাত নেড়ে নিষেধ করল সাদেক খান। 'এই কিছুক্ষণ আগেই কর্নেল বটব্যাল খান্নাকে বলল বিজয়ভদ থেকে রাজামুন্দ্রি পর্যন্ত প্রত্যেকটা গাড়ি যেন সার্চ করা হয়। গাড়িতে পালাতে পারবেন না, জনাব।'

চম্‌কে উঠল রানা। চট্ করে চাইল ডক্টর ফৈয়াজের দিকে। মাথা ঝাঁকালেন বদ্ধ, পাগলের প্রলাপ নয়, ঠিকই বলছে সাদেক খান।

'কতটা বিশ্বাসযোগ্য?' জিজ্ঞেস করল রানা সংক্ষেপে।

'সেন্ট পারসেন্ট,' জবাব দিলেন ডক্টর ফৈয়াজ।

'তাহলে উপায়?'

'উপায় ও-ই বাতলে দেবে। আচ্ছা, সাদেক, ট্রেন সম্পর্কে কেউ কোন আলাপ করেছে কিনা দেখো তো চিন্তা করে?'

'না। ট্রেন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল খান্না কর্নেলকে। সে বলেছে স্টেশনে ঢুকতে সাহস পাবে না পলাতকেরা। শুধু শুধু ট্রেনের যাত্রীদের হয়রানি করা ঠিক হবে না।'

উঠে দাঁড়াল রানা। 'আমি এক্ষুণি গিয়ে রাজামুন্দ্রির টিকেট করে আনছি। আপনারা জঙ্গলের আরেকটু ভিতরে গিয়ে অপেক্ষা করুন।'

'কিন্তু সেটা কি ঠিক হবে? একা...' কিছু বলতে যাচ্ছিল শায়লা, বাধা দিল রানা।

'এছাড়া আর কিছুই করবার নেই আমাদের, শায়লা। এটা এতই বিপজ্জনক যে সাদেক খান না বললে কিছুতেই এক পা-ও যেতাম না আমি স্টেশনের দিকে। ঠিক এই কারণেই ওরা স্টেশনটা ধর্তব্যের বাইরে রেখেছে- ট্রেনে করে আমরা পালাবার ঝুঁকি নিতে পারি একথা কল্পনাতেও আসেনি বটব্যাল লোকটার। তাই ওটাই এখন একমাত্র বিপদমুক্ত পথ। আর একার কথা বলছ, একা গেলেই বিপদের সম্ভাবনা কম। যদি গোলমাল দেখি একা কেটে পড়তে সুবিধা হবে আমার- সবাই থাকলে অসুবিধায় পড়ব তখন। যদি দেখি সব ঠিক আছে তাহলে ফিরে এসে নিয়ে যাব তোমাদের। আর যদি না ফিরি তাহলে বুঝবে কোনও কিছু ঘটেছে। তাহলে যেভাবে পারো হায়দ্রাবাদ যাওয়ার চেষ্টা করবে। একটা ঠিকানা লিখে দিচ্ছি, এই ঠিকানায় দেখা করবে ইউসুফ গজনভি বলে একজন লোকের সঙ্গে। ও তোমাদের পাকিস্তানে পৌঁছবার ব্যবস্থা করে দেবে।' একটুকরো কাগজে খসখস করে লিখল রানা ঠিকানাটা। তার নিচে লিখল- সাদেক খানকে সঙ্গে নেয়ার কোন দরকার নেই।

কিছু বলতে যাচ্ছিল শায়লা, বাধা দিয়ে কথা বলে উঠলেন ডক্টর

ফৈয়াজ।

‘ঠিকই বলেছে রানা। একা গেলেই বরং বিপদের আশঙ্কা কম। তুমি যদি এক ঘণ্টার মধ্যে না আসো তাহলে এই জায়গা থেকে ঠিক আধমাইল উত্তরে জঙ্গলের মধ্যে সরে গিয়ে তোমার জন্যে অপেক্ষা করব আমরা আজ সারাদিন। যদি অন্য কোন কারণে দেরি হয় তাহলে ওখানে দেখা পাবে আমাদের।’

‘আজকের বেশি কিন্তু কোনও অবস্থাতেই দেরি করবেন না।’ সাদেক খানের দিকে চাইল রানা। চিৎ হয়ে শুয়ে চোখ বন্ধ করে গুনগুন গান গাইছে সে। ‘ওকে সামলাতে পারবেন? না সঙ্গে নিয়ে যাব?’

‘ওকে রেখেই যাও। কোন অসুবিধে হবে না। আমরা সামলাতে পারব।’ পকেট থেকে কিছু টাকা আর একটা ক্ষুরধার ছুরি বের করে দিলেন বৈজ্ঞানিক রানার হাতে। ছুরিটার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, ‘এটা সাথে রাখো। দরকার হতে পারে।’

রাস্তায় উঠেই দ্রুতপায়ে এগোল রানা স্টেশনের দিকে। ফর্সা হয়ে আসছে চারদিক। বেশি লোকজন রাস্তায় বেরিয়ে আসার আগেই পৌঁছতে হবে ওকে স্টেশনে।

স্টেশনের বাইরে দাঁড়িয়ে সাবধানে চারদিকে চাইল রানা। একটা পান-বিড়িওয়ালা ছোকরার কাছ থেকে সিজার সিগারেট কিনল পাঁচটা। কোন পুলিস বা মিলিটারি চোখে পড়ল না ওর। অসাধারণ কিছুই চোখে পড়ল না। স্টেশনের স্বাভাবিক দৈনন্দিন কাজকর্ম চলছে। সুইপার ঝাড়ু দিচ্ছে প্ল্যাটফরম, নোংরা কাঁথা গায়ে একপাশে শুয়ে আছে কয়েকজন লোক, অসংখ্য মাছি ভন ভর করছে। বুকিং অফিসের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। কাউণ্টারে বসে গাল চুপসানো একজন বয়স্ক লোক চশমাটা নাক পর্যন্ত নামিয়ে নিয়ে মাথা পিছন দিকে করে খবরের কাগজ পড়ছে।

চারপাশে চোখ বুলাল রানা একবার। আপার ক্লাস ওয়েটিং রুমের দরজাটা খুলে গেল। প্রকাণ্ড গোঁফওয়ালা এক জমাদার বেরোল সেখান থেকে, বগলে নারকেলের ঝাড়ু আর হাতে বালতি।

‘যাবেন কোথায়?’ গলার স্বর ভেসে এল কাউণ্টারের ওপাশ থেকে।

‘রাজামুন্দ্রির চারটে টিকেট দিন,’ বলল রানা পরিষ্কার হিন্দিতে।

বিনা-বাক্য-ব্যয়ে কড়ায় গণ্ডায় পয়সা বুঝে নিয়ে চারটে টিকেট বের করে খটাং খটাং ডেট লাগিয়ে দিল চমশাধারী। তারপর বলল, ‘আটটায় ছাড়বে গাড়ি।’

একটা গাড়ি এসে ইন্ করছে তখন স্টেশনে। রানাকে ওটার দিকে চাইতে দেখে বলল, ‘এটা না। এটা হায়দ্রাবাদ এক্সপ্রেস।’

মাথা নাড়ল রানা- যেন আগে থেকেই জানে, এমনি ভাবে। তারপর

ঘুরে দাঁড়াল। তাহলে ঠিকই বলেছে সাদেক খান। ওরা কল্পনাও করতে পারেনি যে রানারা ট্রেনের সাহায্য নিতে পারে।

কয়েক পা এগিয়েই একজন হায়দ্রাবাদ থেকে আগত যাত্রীর সাথে ধাক্কা খেল রানা।

'মাফ করবেন,' বলে সরে যাচ্ছিল রানা; হঠাৎ ধক করে উঠল ওর বুকের ভিতরটা। সর্বাঙ্গ বরফ-জমা আড়ষ্ট হয়ে গেল।

বিস্মিত ভীত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে লোকটা ওর মুখের দিকে।

প্রফেসর সন্তোষ মুখার্জী!

আট

হাঁ হয়ে গেছে সন্তোষ মুখার্জীর মুখ। চোখ দুটো বিস্ফারিত। পকেটের মধ্যে ছুরির বাঁটটা চেপে ধরল রানা। ব্যস্তসমস্ত লোকজন আর কুলি, সবার নজর রাস্তার দিকে। চশমাধারী টিকেট বিক্রেতা অমনযোগী দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ওর দিকে।

'আপনি এখানে কি করছেন?' জিজ্ঞেস করল সন্তোষ ফ্যাঁশফেঁশে শুষ্ক কণ্ঠে।

'সেরে গেছি,' বলল রানা। পরিষ্কার বুঝল কোন রকম গুল মেরে ধুলো দিতে পারবে না সে সন্তোষ মুখার্জীর চোখে। একমাত্র উপায় এখন ছুরিটা।

'অসম্ভব!' বলল প্রফেসর।

'অসম্ভব কেন হবে? আপনি বলেছিলেন দুইদিনে সেরে যাব। এক ডোজ ওষুধ পড়তেই সবাইকে আশ্চর্য করে দিয়ে সেরে উঠেছি আমি। আপনি হেলিকপ্টার নিয়ে চলে যাওয়ায় ক্যাপ্টেন খান্না হায়দ্রাবাদ যেতে বললেন ট্রেনে করে- ওখান থেকে যাব দিল্লী। কয়েকটা জরুরী কথা মনে পড়েছে আমার...'

স্পালিয়েছ!' বলল মুখার্জী চাপা কণ্ঠে। চট্ করে ওর চোখটা রাস্তার দিকে গেল একবার। ধূর্ত হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটের কোণে। 'দু'জন পুলিস আসছে এদিকেই।'

রানা পিছন ফিরে চাইল না, কিন্তু বুঝল কথাটা মিথ্যে নয়।

আবার কথা বলল মুখার্জী। 'কোনও ভাবে পালিয়েছ তুমি ক্লিনিক থেকে। আমি যা বলব তাই যদি করো তাহলে কিছুই অসুবিধায় পড়তে হবে না তোমাকে। নইলে এক্ষুনি পুলিস ডাকব আমি। আমার সঙ্গে দ্বীপে ফিরে যেতে হবে তোমাকে।'

কোন জবাব দিল না রানা। পিছনে ভারি বুটের শব্দ শুনতে পেল সে।

আবার হাসল সন্তোষ মুখার্জী। 'তুমি বড় কঠিন ফাঁদে পা দিয়েছ এবার, মাসুদ রানা। কঠিন শিক্ষা দেয়া হবে তোমাকে। এসপিয়োনাজে এখনও তোমরা কতখানি পিছিয়ে আছ সেটা টের পাবে মিস্ বটব্যালের সাথে দেখা হলেই।'

'মিস্ বটব্যাল?'

'হ্যাঁ। সমস্ত প্ল্যানের পেছনে আছে একটি মাত্র ব্রেন। কর্নেল বটব্যাল। বিনা বাধায় এতদূর পর্যন্ত আসতে পেরে ভেবেছ তোমাদের বুদ্ধিমত্তার তুলনা নেই। দ্বীপে ফিরে গিয়েই টের পাবে সব। যাক্, একটা উপকার করেছ তুমি আমার। তোমাকে ধরে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেই ক্লিনিকের হেড বানিয়ে দেয়া হবে আমাকে।'

অনেক কাছে চলে এসেছে বুটের শব্দ। পকেট থেকে হাতটা বেরিয়ে এল রানার। মুখ খুলল প্রফেসর পুলিস ডাকবার জন্যে। ঠিক সেই সময় রানার হাঁটুটা দ্রুত একবার উঠেই নেমে গেল। ব্যাপারটা এতই দ্রুত এবং সহজ ভঙ্গিতে ঘটে গেল যে কেউ লক্ষই করল না, শুধু টের পেল সন্তোষ মুখার্জী। তলপেটে প্রচণ্ড আঘাত লাগতেই ব্যথায় কুঁকড়ে গেল সে। যেন ওকে সাহায্য করছে এমনিভাবে বাম হাতে ওর পিঠ জড়িয়ে ধরল রানা, সেইসঙ্গে ডানহাতে ধরা চার ইঞ্চি ব্লেডের ছুরিটা সোজা ঢুকে গেল ওর হৃৎপিণ্ড বরাবর। লোকটাকে হত্যা করবার ইচ্ছে ছিল না রানার- কিন্তু উপায় নেই, কেবল রানার নয়, শায়লা, ডক্টর ফৈয়াজ এবং সাদেক খানের নিরাপত্তার ভারও এখন রানার ওপর।

অস্ফুট একটা গোঙানির শব্দ শুনতে পেল রানা, তারপরই সব চুপ। রানার ওপরই হেলে পড়ল প্রফেসর সন্তোষ। ওকে ধরে এদিক-ওদিক চাইল রানা। জোরে জোরে বলল, 'অজ্ঞান হয়ে গেছে মানুষটা।'

টিকেট কাউণ্টার থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল চশমাধারী। ছুরির বাঁটটা দেখা যাচ্ছে- ওটা হাতের তালু দিয়ে চেপে আরেকটু ঢুকিয়ে দিল রানা, তারপর কোটটা টেনে দিল তার ওপর।

'বেঁচে আছে, এক্ষুণি বাসায় নিয়ে যেতে হবে ওকে। একটা ট্যাক্সি ডাকুন না মশাই, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি তামাশা দেখছেন?'

একজন যাত্রী ছুটল ট্যাক্সি ডাকতে। কিংবা কেটে পড়ল সে।

'কি হয়েছে?' প্রশ্ন করল একজন রানার ঘাড়ের ওপর দিয়ে ঝুঁকে। রানা ঘাড় ফিরিয়ে দেখল পুলিস।

'হার্ট অ্যাটাক্,' বলল রানা। 'বাড়ি নিয়ে যেতে পারলেই ঠিক হয়ে যাবে।'

আরও কাছে ঘেঁষে এল পুলিস দু'জন। একজন বলে উঠল, 'আরে। এ তো প্রফেসর সন্তোষ। একে চিনি, ওঙ্কার দ্বীপের লোক।'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন,' বলল রানা। 'আমিও ওখানকার লোক। এই দেখুন আমার আইডেণ্টিটি কার্ড। কিন্তু জল্‌দি করুন, নইলে মারা যাবেন প্রফেসর।'

'আমি ধরছি পায়ের দিকটা,' বলল একজন পুলিস।

'তার দরকার হবে না। আপনি ট্যাক্সির ব্যবস্থা করুন,' ট্যাক্সি ডাকতে গেল একজন। ঝুঁকে পড়া দেহটা টেনে সোজা করল রানা। বলল, 'আমারই দোষ। গতরাতে দ্বীপে একটা দুর্ঘটনায় আমাদের ল্যাবরেটরি চুরমার হয়ে গেছে। সেই খবর দেবার জন্যে পাঠানো হয়েছে আমাকে। কিন্তু খবরটা শুনেই যে উনি এমন মুষড়ে পড়বেন তা বুঝতে পারিনি।'

'আমরাও বিস্ফোরণের শব্দ শুনেছি। আগুনও দেখা গেছে ইলোর থেকে। আমাদের এস.পি. আইন ভেঙে রেডিও মারফত যোগাযোগ করবার চেষ্টা করেছিলেন- কোনও জবাব পাওয়া যায়নি দ্বীপ থেকে,' বলল দ্বিতীয় পুলিস।

'কেউ জখম হয়নি। ভগবানের কৃপা।' সন্তোষ মুখার্জীর ডানহাতটা নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে ডাক্তারী ভঙ্গির অনুকরণ করে বলল রানা, 'কোনও ভয় নেই, স্যার, এক্ষুণি ঠিক হয়ে যাবেন বাসায় গেলেই। চোখে মুখে ঠাণ্ডা জল...'

'আমি ধরছি আরেক হাত,' বলল দ্বিতীয় পুলিস।

বাম হাতটা উঁচু করেই চমকে ছেড়ে দিল সে। কোটটা সরে গিয়েছিল হাতটা তুলতেই- ছয় ইঞ্চি পরিমাণ জায়গা রক্তে ভিজে লাল হয়ে গেছে সাদা শার্ট। মৃতদেহটার দিকে চাইল সে বিস্মিত দৃষ্টিতে।

তারপরই রানা, চশমাধারী আর কন্‌স্টেবল্ তিনজনেরই চোখ পড়ল দেড় ইঞ্চি বেরিয়ে থাকা ছুরির বাঁটের ওপর। আঁতকে উঠল চশমাধারী, ডাণ্ডাটা ডানহাতে নিল কন্‌স্টেবল।

ধাক্কা দিয়ে সন্তোষ মুখার্জীকে ফেলল রানা পুলিসটার ওপর। দৌড় দিতে গিয়ে দেখল ওর জামা টেনে ধরেছে চশমাধারী টিকেট বিক্রেতা। এক থাবড়া দিয়ে দাদার আমলের চশমাটা ওর নাকের ওপর ভেঙে বসিয়ে দিয়ে ছুটল রানা রাস্তার দিকে। ফিরে আসছিল প্রথম পুলিসটা গেটের সামনে ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে। ওকে পাশ কাটিয়ে দৌড় দিল রানা। কিন্তু পাশ থেকে ল্যাঙ মারল সে রানার পায়ে।

দড়াম করে শানের ওপর আছড়ে পড়ে পিছলে কয়েক হাত সামনে এগিয়ে গেল রানার দেহটা মাটিতে মুখ গুঁজে।

'গর্দভ, বুদ্ধু, উল্লুক কোথাকার!' জ্বলে উঠল মুখোশের অন্তরালে ললিতার চোখ দুটো। মেকি হাসিটা লেগেই আছে মুখোশের ঠোঁটে। মাথা নামাল

ক্যাপ্টেন খান্না। 'তোমাকে কতবার করে সাবধান করেছি, ভয়ঙ্কর ধূর্ত লোক ওই মাসুদ রানা। সাবধানতার এই নমুনা দেখালে শেষ পর্যন্ত!'

'কিন্তু আপনিই তো ওকে ছেড়ে রাখতে বলেছিলেন,' বলল খান্না ভয়ে ভয়ে।

'ছেড়ে রাখতে বলেছিলাম, ছেড়ে দিতে বলিনি!'

'কিন্তু কম্পিউটার রূম কি করে ধ্বংস করল...আ র্য! দুঃস্বপ্নের মত লাগছে ব্যাপারটা আমার কাছে।'

'দুঃস্বপ্ন মাত্র আরম্ভ হয়েছে, খান্না। কম্পিউটার শেষ, মাসুদ রানা, সাদেক খান, ডক্টর ফৈয়াজ গায়েব; সত্যিকার দুঃস্বপ্ন দেখার এখনও বাকি আছে তোমার। সরকার যদিও ছাড়ে, কবীর চৌধুরী তোমাকে ছেড়ে দেবে ভেবেছ? আসছে সে শিকারি বাজপাখির মত।'

'কিন্তু আমি কি করব বলুন? আপনি বললেন প্রথম রাতে বিশ্রাম নেবে মাসুদ রানা, কিছুই করবে না- প্রফেসর সন্তোষ বললেন ডক্টর ফৈয়াজ ওষুধ দিয়ে ওকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে বারো ঘণ্টার জন্যে- আমার চোরা মাইক্রোফোনগুলোতেও সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া গেল না। আমার দোষটা কোথায়?'

'এসব যুক্তি-তর্ক আমাকে দেখিয়ে লাভ নেই, কবীর চৌধুরীকে দেখিয়ো। খবর পেয়েই রওনা হয়ে গেছে সে দ্বীপের উদ্দেশে। এখন বলো, নতুন কি সংবাদ পেয়েছ?'

'আপনার কথামত সমস্ত রাস্তাঘাট ব্লকের ব্যবস্থা হয়েছে। যাদের জঙ্গলে খুঁজতে পাঠানো হয়েছিল ওদের কাছ থেকে কোন সংবাদ পাইনি এখনও। আজই দশটার মধ্যে বিজয়ভদ থেকে স্পেশাল ফোর্স পৌঁছে যাবে। সমস্ত নদী পথেও কড়া পাহারা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আপনি যে গুহাটার কথা বলেছিলেন ওখানে পাওয়া যায়নি কাউকে, এখন খালের অন্য পাড়টার জঙ্গল খোঁজা হচ্ছে তন্ন তন্ন করে।'

'কালই শেষ করে দিতাম আমি ব্যাটাকে, হেলিকপ্টার থেকে হ্যাণ্ড গ্রেনেড ফেলে, কিন্তু হঠাৎ খেয়াল হলো, তাহলে সাদেক খান আর ডক্টর ফৈয়াজও শেষ হয়ে যাবে, মাঝখান থেকে বিপদে পড়ব আমি। মেশিনগানে চেষ্টা করলাম, পারা গেল না,' বলল ললিতা ক্ষোভের সঙ্গে। 'ধরা ওদের পড়তেই হবে। এখন বাধা দিতে গিয়ে গুলি খেয়ে মারা না পড়লেই বাঁচা যায়।'

'আমি বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছি সবাইকে, কাউকে যেন পারতপক্ষে প্রাণে মারা না হয়। সার্চ পার্টিতে আমিই থাকতাম, কিন্তু এই দ্বীপ ভ্যাকেট করার ব্যাপারে আমার এখানে না থাকলেও আবার চলে না।'

ঠিক এমনি সময় বেজে উঠল রেডিও টেলিফোন। রিসিভার তুলে নিল

ললিতা বটব্যাল। খবরটা শুনেই চমকে উঠল সে। হাত কাঁপছে ওর থর থর করে।

'কি রকম দেখতে লোকটা? চেহারার বর্ণনা দিন।' মন দিয়ে শুনল সে বর্ণনাটা।

'হ্যাঁ, আমাদের লোক। কিন্তু আর সবাই? ওর সঙ্গে আরও তিনজন ছিল, তারা কোথায়?'

উত্তরটা শুনে একটু যেন হতাশ হলো ললিতা।

'ঠিক আছে। আমি আধঘণ্টার মধ্যে আসছি।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে ফিরল সে ক্যাপ্টেন খান্নার দিকে।

'ধরা পড়েছে মাসুদ রানা। সন্তোষকে খুন করে ইলোর রেল স্টেশন থেকে পালাবার চেষ্টা করছিল সে- ধরে ফেলেছে পুলিস। আটকে রেখেছে হাজতে। এখন আর চিন্তার কিছুই নেই খান্না, বাকি তিনটেকে বের করতে অসুবিধে হবে না। আমার কথাই ঠিক, গুহায় ঢোকেনি যদিও- গুহার পাশ দিয়েই ছ'মাইল হেঁটে চলে গেছে ওরা ইলোর। খালের এপাশের জঙ্গল মিছেমিছি না খুঁজিয়ে এই জায়গাটায় সৈন্য পাঠাও- অনায়াসে ধরতে পারবে ওদের।' একটা ম্যাপের ওপর আঙুল দিয়ে দেখাল কর্নেল ললিতা বটব্যাল।

'আমি এক্ষুণি ইন্‌স্‌টস্যাকশন দিচ্ছি। আপনি কি ইলোর যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ। কিন্তু কবীর চৌধুরী যদি জিজ্ঞেস করে, আমি কোথায় গেছি, বলবে না। মাসুদ রানা যে ধরা পড়েছে সেকথাও যেন ও জানতে না পারে। বুঝেছ?'

'বুঝেছি।'

দুইঘণ্টা অপেক্ষা করল ওরা রানার জন্যে। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিল। অস্থির হয়ে উঠল শায়লা। রাজামুন্দ্রির টেস্ন ছেড়ে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেল ওরা। নি য়ই কিছু একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে।

কাছেই গুলির শব্দ শোনা গেল একটা। বসে বসে ঝিমোচ্ছিল, তড়াক করে উঠে দাঁড়াল সাদেক খান। চোখে-মুখে ওর আতঙ্কের চিহ্ন।

'বাম দিক থেকে এল শব্দটা,' বললেন ডক্টর ফৈয়াজ। 'এখান থেকে সরে যেতে হবে আমাদের।'

'কিন্তু লোকটাকে বিপদের মুখে ঠেলে পাঠিয়ে দিয়ে এভাবে সরে যাওয়া কি ঠিক হচ্ছে, আব্বাজী? যে লোকটা আমাদের জন্যে এতবড় বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল হাসি মুখে, তাকে সাহায্যের চেষ্টা করব না?'

'করব, শায়লা। আমাদের সাধ্যমত সব করব আমরা। কিন্তু আপাতত আরক্ষা করতে হবে। ধরা পড়ে গেলে কাউকে কোন সাহায্যই করতে পারব না। চলো সাদেক, সরে যাই জঙ্গলের ভিতর।'

'অ্যাঁ? ও, চলুন। কিন্তু তাড়াহুড়োর কিছুই নেই। গুলি ছুঁড়ে সঙ্কেত দিল লেফটেন্যান্ট সবাইকে একসাথে জড়ো হওয়ার জন্যে। গুহা পর্যন্ত এসে ফিরে গিয়েছিল এরা। এবার আরও দুই মাইল বাম দিকে সরে গিয়ে কাজ শুরু করবে। তন্ন তন্ন করে প্রত্যেকটা ঝোপঝাড় খুঁজতে খুঁজতে এগোবে এদিকে যাতে একটা খরগোশও নজর না এড়ায়।'

'আব্বাজী! অত ভাবছি কেন? সাদেক খানই তো বলতে পারবে রানা কোথায়।' হঠাৎ বলে উঠল শায়লা।

'রানা? রানা কে?' জিজ্ঞেস করল সাদেক খান ভুরু কুঁচকে।

'মাসুদ রানা। যে আমাদের পালাতে সাহায্য করছে। ও গিয়েছিল আমাদের জন্যে রেলের টিকেট করতে। হয়তো ধরা পড়েছে। ও কোথায় আছে বলতে পারবেন?' বলল শায়লা সাদেক খানের কাছে গিয়ে।

শায়লার একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরল সাদেক খান। 'ওর কোন দরকার নেই। আমিই তোমাদের নিয়ে যাব পাকিস্তানে। কোন চিন্তা নেই। পাকিস্তানে ফিরে বিয়ে করব আমি তোমাকে। তোমাকে ভালবাসি আমি…' একটা হাত শায়লার কাঁধের উপর রাখল সাদেক খান।

'সাবধান, শায়লা!' বললেন ডক্টর ফৈয়াজ অস্ফুট কণ্ঠে।

'রানা কোথায় আছে বলতে পারবেন?' বলল আবার শায়লা। ভীতি চেপে রাখবার চেষ্টা করছে সে প্রাণপণে। 'হাত ছাড়ুন!'

'কেন? আমাকে পছন্দ হচ্ছে না?' বলল সাদেক খান চোখ পাকিয়ে। পর-মুহূর্তে ভাব পরিবর্তন হয়ে গেল ওর। 'কী নরম তোমার শরীর! উহ্, একেবারে মাখনের মত।' গলায়, থুতনিতে হাত বুলাল একটু, তারপর খেপে উঠল ভয়ানকভাবে। 'ভয় পাচ্ছ কেন আমাকে? আমি বাঘ না ভাল্লুক?'

'ভয় পাইনি,' বলল শায়লা ভীত কণ্ঠে।

'আবার মিছে কথা! মনে করছ আমার মাথা খারাপ, কিছুই টের পাই না আমি! মিছেকথা বললে দোজখে যাবে তা জানো?' খামচে ধরল সে শায়লার কাঁধের মাংস। নখগুলো বসে গেছে নরম মাংসের মধ্যে। ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেল শায়লার মুখ।

হঠাৎ কাপড় ধরে টানাটানি শুরু করল সাদেক খান। ছিঁড়ে গেল ব্লাউজ। হাতটা ছাড়াবার চেষ্টা করল শায়লা, কিন্তু দশটা হাতীর শক্তি এখন সাদেক খানের গায়ে। উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে সে। মুখের দুই কষা বেয়ে লালা গড়াচ্ছে।

নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরে চিৎকার বন্ধ করল শায়লা। এখন চিৎকার করলেই শুনতে পাবে সৈন্যরা। হাতটা ছেড়ে দিয়ে মট্ করে ডাল ভেঙে নিল সাদেক খান একটা গাছ থেকে।

'পিটিয়ে লাস করে ফেলব, হারামজাদী। লোভ দেখাচ্ছিস আমাকে?

দাঁড়া!’

দাঁড়িয়ে রয়েছে শায়লা বিবর্ণ মুখে। ঠিক এইভাবেই খুন করেছিল সাদেক খান ক্লিনিকের সেই নার্সটাকে। এবার কাপড় ধরে টানাটানি আরম্ভ করল লোকটা। দুনিয়াটা দুলে উঠল শায়লার চোখের সামনে! আব্বাজী করছে কি, ভাবল একবার সে আবছা ভাবে। চড়াৎ করে পিঠের ওপর পড়ল লাঠির বাড়ি।

‘খুন করে ফেলব তোকে, হারামজাদী…’

নয়

চিৎ হয়ে শুয়ে আছে রানা একটা লম্বা টেবিলের ওপর হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ইলোর পুলিস স্টেশনের মাটির নিচের সেলে। মাথাটা ছাড়া আর কিছুই নড়াবার উপায় নেই। চারদিকে চাইল রানা। বাড়িটা বহুদিনের পুরানো। খুব সম্ভব ইলোরের কোন জমিদারের বন্দীশালা ছিল এটা ইংরেজ আমলে, কিংবা তারও আগে; ঘরের দেয়ালে তারই নিদর্শন হিসেবে কয়েকটা জং ধরা পুরানো তলোয়ার, বর্শা আর তীর ধনুক টাঙানো। আগেকালের সাঁড়াশী জাতীয় কয়েকটা নির্যাতনের যন্ত্রপাতিও আছে। ঘরের তিন দেয়ালে তিনটে লোহার গেট। ওপাশে বোধহয় আরও সেল আছে। চতুর্থ দিকটায় একটা খাড়া সিঁড়ি ওপরে উঠে গিয়ে শেষ হয়েছে একটা বন্ধ দরজার পায়ের কাছে।

শায়লা, ডক্টর ফৈয়াজ আর সাদেক খানের কথা ভাববার চেষ্টা করল রানা। কি করছে ওরা? জঙ্গলের আধ মাইল গভীরে ঢুকে অপেক্ষা করবেন বলেছিলেন ডক্টর ফৈয়াজ। অপেক্ষা করতে নিষেধ করা উচিত ছিল ওর। শুধু শুধুই মূল্যবান সময় ব্যয় হয়ে যাচ্ছে ওদের। ওর সঙ্গে আর দেখা হবে না ওদের কোনদিন।

সিঁড়ির দরজা খুলে গেল। কমলা রঙের একটা শাড়ি চোখে পড়ল রানার। দু'জন নেমে আসছে সিঁড়ি বেয়ে। এস. পি-কে চিনতে পারল রানা, কিন্তু মহিলাকে চিনতে পারল না। রবারের একটা মুখোশ পরা তার মুখে।

দ্রুতপায়ে টেবিলের কাছে চলে এল মহিলা। একটা স্থির হাসি আঁকা আছে মুখোশের ওপর। ছোট্ট দুটো গর্ত দিয়ে উজ্জ্বল এক জোড়া চোখ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল চোখ দুটো রানার মুখের দিকে। পনেরো সেকেণ্ড পার হয়ে গেল নীরবে। অস্বস্তি বোধ করল রানা।

‘হ্যাঁ। এই লোকটাকেই খুঁজছিলাম আমি। সোয়া দুই বছর। আজ আপনি তাকে তুলে দিয়েছেন আমার হাতে, মি. আচারিয়া। দিল্লীতে ফিরে

গিয়েও আপনার কথা স্মরণ থাকবে আমার।'

'সেটা আপনার দয়া। আজ পাঁচ-পাঁচটা বছর কোন প্রমোশন হয়নি আমার। আপনি যদি কেবল স্মরণ রাখেন, সে-ই আমার জন্যে যথেষ্ট। এখন এই লোকটাকে কি হাতকড়া পরিয়ে তুলে দিতে হবে গাড়িতে?'

'না,' বলল মুখোশধারী মহিলা স্থির দৃষ্টিতে রানার মুখের দিকে চেয়ে থেকে। 'লোকে বলে শারীরিক নির্যাতনের কোন মানে হয় না। নির্যাতন করলে যে-কোনও লোক যে-কোন কথা স্বীকার করবে। কয়েক সেকেণ্ড নির্যাতন থেকে বাঁচবার জন্যে যে কোন মিথ্যে কথাকেও সত্যি বলে স্বীকার করবে। এর চেয়ে ওষুধ বা সম্মোহন অনেক ভাল। কিন্তু আমার ধারণা অন্যরকম। আমার দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর যাকে খুঁজে বেড়ালাম তাকে ধরে যদি স্কোপোলামিন দিয়ে সব কথা স্বীকার করিয়ে ফেলি- পরদিন একটা গোপন বিচারকক্ষে বিচার হয়ে যাওয়ার পর গুলি করে হত্যা করা হয় তাকে, তাহলে শিকারীর মজাটা রইল কোথায়? ধীরে ধীরে নির্যাতন করে হত্যা করবার অধিকার রয়েছে শিকারীর। আপনার কি মনে হয়?'

'নি য়ই। একশোবার অধিকার আছে,' বলল এস.পি. আচারিয়া।

'তাহলে ওপরে গিয়ে শক্তিশালী আর নিষ্ঠুর দেখে একজন লোককে পাঠিয়ে দিন। ওপরেই অপেক্ষা করবেন আমার জন্যে। আপাতত কয়েকটা কথা বের করতে হবে এই লোকটার মুখ থেকে। এখানে আপনার উপস্থিতির কোন প্রয়োজন নেই।'

সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল এস.পি. অনুগত ভৃত্যের মত। রানা মহিলার অসামান্য ক্ষমতার কথা ভেবে আ র্য হলো। কে এই মহিলা? সেই বটব্যাল? সন্তোষ আজ যার কথা বলছিল শ্রদ্ধার সঙ্গে? মুখে মুখোশ কেন?

খড়ম পায়ে নিচে নেমে এল একজন প্রকাণ্ড চেহারার লোক। হাফ প্যান্ট পরা, খালি গা। মস্ত ভুঁড়ি ঠেলে বেরিয়ে এসেছে হাত দেড়েক। মোটা একগাছি টিকি ছেড়ে পুরোটা মাথা পরিষ্কার করে কামানো। কপালে তিনটে সাদা চন্দনের দাগ, গলায় পৈতে। ছোটবেলায় দেখা হিন্দী গাঁজাখুরি সিনেমার দৈত্যের মত দেখতে। হাতে-পায়ে থোকা থোকা পেশী। রানা আন্দাজ করল- মাদ্রাজী।

'বাহ্। চমৎকার ভুঁড়ি বাগিয়েছ তো ঘুষ খেয়ে খেয়ে। কি নাম তোমার?'

'ঘটোৎকচ।'

'দেখতেও ঠিক ওই রকমই। এইখানে এসে দাঁড়াও। যা বলব সেই মত কাজ করবে। যাক, শোনো, মাসুদ রানা। সাদেক খান, আবদুল্লাহ্ ফৈয়াজ আর ওই মেয়েলোকটা কোথায় আছে বলতে হবে তোমাকে। দুই মিনিট সময় দিলাম।'

দুই মিনিট কেটে গেল চুপচাপ। এবার মহিলা ফিরল ঘটোৎকচের দিকে।

'ওর ডানহাতটার কনুইয়ের ওপর হাঁটু ঠেকিয়ে উল্টোদিকে চাপ দিয়ে ভেঙে ফেলো। যতক্ষণ না ও আমার কথার উত্তর দেবে ততক্ষণ একটা একটা করে হাত-পা ভাঙতে থাকবে। উত্তরটা আমার জানা হয়ে গেলে তখন ওকে মেরে ফেলা হবে- সেটুকু কাজ আমি নিজেই করব।'

মহিলার কণ্ঠস্বরে ভয়ঙ্কর একটা ঘৃণার আভাস ফুটে উঠল। অবাক হলো রানা।

রানার ডান হাতের বাঁধন খুলে ফেলল ঘটোৎকচ। হাত টেনে নেয়ার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু পারল না। অসম্ভব শক্তি মোটা লোকটার গায়ে। টেনে সোজা করে রেখে কনুই-এর ওপর হাঁটু ঠেকাল ঘটোৎকচ। একহাতে কব্জি আরেক হাতে বাইসেপ চেপে ধরল সে- এবার এক হ্যাঁচকা টান দিলেই মড়াৎ করে ভেঙে যাবে রানার হাতটা মাঝখান থেকে।

'তুমি আমাকে এত ঘৃণা করো কেন, কি করেছি আমি তোমার?' জিজ্ঞেস করল রানা মহিলাকে।

'আচ্ছা! তুমি এখনও জানোই না কেন তোমাকে এত ঘৃণা করি আমি? তাহলে তাকাও আমার দিকে, মাসুদ রানা। এক নিমেষে বুঝতে পারবে তুমি তার কারণ।' টান মেরে মুখোশটা খুলে ফেলল মহিলা। রানার মুখের সামনে নিয়ে এল ওর বীভৎস মুখ। মুখটা এপাশ-ওপাশ ফিরিয়ে দেখাল রানাকে ভাল করে। লাল লাল ক্ষতগুলোয় পুঁজ জমেছে, দুর্গন্ধ আসছে সেখান থেকে। ভয়ঙ্কর এক পৈশাচিক চেহারা।

রানার হাত ছেড়ে দিয়ে বিড় বিড় করে রাম নাম জপতে জপতে সিঁড়ির দিকে রওনা দিয়েছিল ঘটোৎকচ, পিছন থেকে 'থামো' বলে একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল প্রস্তর মূর্তিবৎ। শিরদাঁড়া সোজা রেখে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে এবার জোরে জোরে রাম নাম জপতে থাকল দৈত্যটা- এক হাতে মুঠি করে ধরে আছে পৈতে, পিছন ফিরে চাইবার সাহস সঞ্চয় করতে পারল না।

রানাও ভয় পেয়েছে। এমন বীভৎস মুখ জীবনে কখনও দেখেনি সে। কিন্তু সেই সঙ্গে এক অদ্ভুত করুণা দেখা দিল ওর মনের মধ্যে।

'কে তুমি!' জিজ্ঞেস করল সে।

'ললিতা বটব্যাল।'

'ললিতা বটব্যাল! কিন্তু তুমি না মারা গিয়েছিলে? আম্বালা হাসপাতালে...আমি ভেবেছিলাম মারা গেছ তুমি!'

'মরিনি। বহুদিন ভেবেছি সেদিন মরে গেলেই ভাল হত। আত্মহত্যার চেষ্টা করেছি বহুবার- প্রতিবারই শেষ মুহূর্তে ভেবেছি প্রতিশোধ না নিয়ে

মরার কোনও মানে হয় না। আজ সেই সুযোগ এসে উপস্থিত হয়েছে।' ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে একটা কাঁচের জার বের করল ললিতা বটব্যাল। 'কনসেনটেস্টেড সালফিউরিক অ্যাসিড। নির্যাতন করে তৃপ্ত হবার পর এই অ্যাসিড ছিটিয়ে দেব আমি তোমার সারা মুখে। আয়নায় দেখতে পাবে সালফিউরিক অ্যাসিড ছিটিয়ে দিলে নিজের চেহারা কেমন লাগে দেখতে।'

সত্যিই করুণা হলো রানার। বলল, 'নিজের দোষ কাটাবার জন্যে বলছি না, ললিতা, কিন্তু সত্যি বলছি, ইচ্ছে করে তোমার এত বড় সর্বনাশ আমি করিনি। বোতলটার মধ্যে যে অ্যাসিড ছিল তা-ও জানা ছিল না আমার।' শিউরে উঠে অন্যদিকে মুখ ফেরাল রানা। একজন সুন্দরী স্ত্রীলোকের পক্ষে এটা যে কত বড় ক্ষতি, কেন সমস্ত অন্তর দিয়ে ঘৃণা করে ওকে ললিতা, বুঝতে পারল রানা। নিজেকে মস্তবড় অপরাধী মনে হলো ওর।

'যাই হোক, এখন নি য়ই আমার ঘৃণার কারণটা জানতে বাকি নেই তোমার? এবার ধরে নেয়া যাক, তুমি কিছুতেই বলবে না কোথায় আছে শায়লা, সাদেক খান আর ডক্টর ফৈয়াজ। নাও, তোমাকে যা বলেছিলাম তাই করো ঘটোৎকচ।'

বড় বড় চোখ করে ভয়ে ভয়ে পিছন ফিরে চাইল ঘটোৎকচ। আবার একটা ধমক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল ঝট করে, কিন্তু পৈতে ছাড়ল না।

ঠিক এমনি সময় একজন কনস্টেবল দ্রুতপায়ে নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে।

'টেলিফোন এসেছে, কর্নেল...' ললিতার মুখের দিকে চেয়েই আটকে গেল ওর মুখের কথা। তারপর বলল, 'ক...ক্ক...ক্কর্নেল বটব্যালের টে-টেলিফোন।'

'কে করেছে?'

'ক-ক্ক-কবীর চৌধুরী!' বলেই পিছন ফিরে ছুটল সিঁড়ির দিকে।

'কবীর চৌধুরী!' গলাটা একটু কেঁপে উঠল ললিতার। অস্ফুট কণ্ঠে বলল, 'ও জানল কি করে যে আমি এখানে? নি য়ই খান্না বলেছে। ঠিক আছে, দেখে নেব আমি ওকে। কিন্তু কবীর চৌধুরী আসার আগেই এখানের কাজ শেষ করে ফেলতে হবে।' মুখোশটা মুখে লাগিয়ে নিয়ে এগোল সে সিঁড়ির দিকে। একটু থেমে ঘাড় ফিরিয়ে ঘটোৎকচকে বলল, 'এখানেই থাকো। আমি আসছি পাঁচ মিনিটের মধ্যে।'

তিন মিনিটের মধ্যেই হৃত সাহস ফিরে এল ঘটোৎকচের। টেবিলের ওপর চিৎ হয়ে পড়ে থাকা রানার অসহায় অবস্থা দেখে আরও একটু বাড়ল সাহস। এতক্ষণের কথোপকথন আবার একবার মনে মনে খতিয়ে দেখে বুঝল, আসলে ভূত-প্রেত কিছুই নয়, এই লোকটা বছর দু'য়েক আগে অ্যাসিড দিয়ে চেহারা খারাপ করে দিয়েছিল কর্নেলের। তারপরেই মনে পড়ল কর্নেলের হুকুমের কথা। ফিরে এসে হাতটা ভাঙা না পেলে ওর

বারোটা বাজিয়ে দেবে কর্নেল। দুটো হাতই ভেঙে রাখা বোধহয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

আবার এগিয়ে এসে চেপে ধরল সে রানার হাত। হাঁটু ঠেকাল কনুই বরাবর। একহাতে কব্জি আরেক হাতে বাইসেপ টিপে ধরল শক্ত করে। জোরে টান দিলেই মড়াৎ করে ভেঙে যাবে রানার হাত।

চাপ বাড়তে আরম্ভ করল। ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেছে রানার মুখ, আঁধার হয়ে আসছে চোখ।

দশ

'থামো!' নেমে এল ললিতা সিঁড়ি বেয়ে। 'কি করছ?'

মুখোশটা মুখে লাগানো আছে দেখে অনেকটা আশ্বস্ত হলো ঘটোৎকচ। বলল, 'হাতটা ভাঙছিলাম স্যার, থুড়ি, ম্যাডাম।'

'ওটা একটু পরে ভাঙলেও চলবে, নতুন একটা প্ল্যান এসেছে মাথায়। দেয়াল থেকে ওই মুগুরটা পেড়ে আনো।'

একটু অবাক হলো ঘটোৎকচ, কিন্তু আদেশ মত দেয়ালে টাঙানো একটা মুগুর নিয়ে এল। এটা দিয়েই বোধহয় ছাতু করে দেয়া হবে ওর মাথাটা, ভাবল রানা।

'দাও ওটা আমার হাতে। এবার এর হাত পায়ের সমস্ত বাঁধন খুলে দাও। কি নাম যেন বলেছিলে তোমার?'

'ঘটোৎকচ।' রানার হাত পায়ের বাঁধন খুলতে খুলতে বলল সে। এই লোকটার বাঁধন খুলে দেয়া উচিত হচ্ছে বলে মনে হলো না ওর, কিন্তু ললিতার কথার ওপর কোন কথা বলবার সাহস হলো না।

'ঠিক আছে। এইবার লোকটাকে তুলে দাঁড় করাও। দুই হাতে শক্ত করে ধরে রাখবে যেন নড়তে না পারে। হ্যাঁ। এবার আমার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াও।'

'ধাঁই করে পড়ল মুগুরটা ঘটোৎকচের ন্যাড়া মাথার ওপর। একটা তীক্ষ্ণ যন্ত্রণাধ্বনি বেরোল ওর মুখ থেকে। ছেড়ে দিল সে রানাকে। আবার পড়ল মুগুর। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ঘটোৎকচ। তৃতীয় আঘাতেই শুয়ে পড়ল জ্ঞান হারিয়ে।

'জলদি চলো, রানা! সময় নেই হাতে!'

'কি ব্যাপার, ললিতা...?'

'ললিতা নয়, শায়লা ফৈয়াজ। জলদি। এক্ষুণি ভাগতে হবে আমাদের!' রানার দুই চোখে বিস্ময় আর অবিশ্বাস দেখে মুখোশটা খুলে দেখাল শায়লা।

রানা দেখল শায়লার কপালে একটা কাটা দাগ দেখা যাচ্ছে, বাম গালে স্পষ্ট হয়ে আছে পাঁচ আঙুলের দাগ। জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছিল? ধরা পড়েছিলে?' ডান হাতটা কয়েকবার ভাঁজ করল রানা। কমে যাচ্ছে ব্যথাটা।

'না। পরে বলব সবকথা। এখন যে-কোন লোক যে-কোন মুহূর্তে এসে পড়তে পারে। আমার আগে আগে চলো মাথা নিচু করে।' মুখোশটা পরে নিল শায়লা আবার।

'এখান থেকে বেরোবে কেমন করে? ঢুকলেই বা কি করে? আ র্য!' রওনা হলো সিঁড়ি বেয়ে ওপর দিকে।

'ওদের বলব, তুমি তোমার সঙ্গীদের ধরিয়ে দিতে রাজি হয়েছ, তাই নিয়ে যাচ্ছি আমি। কোনও গোলমাল করতে সাহস পাবে না পুলিস। ললিতার ক্ষমতা সাংঘাতিক।'

'কোথায় সে এখন?'

'এস.পি.-র অফিস রুমের অ্যাটাচড বাথরুমে পড়ে আছে। এস.পি.-র হাণ্টারটা ভেঙেছি আমি ওর মাথার ওপর। এইবার খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলো-ভাব দেখাবে যেন কঠোর নির্যাতনে আধমরা হয়ে গেছ। তার ওপর সব কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়ে লজ্জায় মিশে যাচ্ছ মাটির সঙ্গে।'

আগে আগে ঢুকল রানা এস.পি.-র অফিস রুমে, পিছন পিছন শায়লা। চট্ করে বাথরুমের বন্ধ দরজার ওপর থেকে একবার ঘুরে এল রানার চোখ-এর মধ্যে বাথরুমের দরজা খোলেনি তো কেউ?

দু'জন লোকের সঙ্গে কথা বলছিল এস.পি.। রানাকে দেখে অবাক চোখে চাইল, কিন্তু পিছনে শায়লাকে দেখেই তড়াক করে উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে।

'স্বীকার করেছে। ওর সাথের তিনজন কোথায় আছে দেখিয়ে দিতে রাজি হয়েছে। এক্ষুণি একটা জীপের ব্যবস্থা করুন।'

'নি য়ই। এক্ষুণি ব্যবস্থা করছি।' ইশারা করতেই একজন লোক ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। 'ঘটোৎকচ কোথায়?'

'নিচেই আছে। রক্তটক্ত পরিষ্কার করে আসবে এক্ষুণি। লোকটা ভাল, কিন্তু এত সহজে সব কথা স্বীকার করে ফেলায় মন খারাপ হয়ে গেছে ওর।'

হাসল এস.পি.। বলল, 'মাদ্রাজের কুস্তি চাম্পিয়ান লোকটা। যাক, আপনার গাড়ি এসে যাবে এক্ষুণি। সঙ্গে লোক দেব কয়জন? আপনি কি একা সামলাতে পারবেন একে?'

'নি য়ই। লোকের দরকার নেই। ব্যাটার হাতে একটা হ্যাণ্ডকাফ পরিয়ে চাবিটা আমার কাছে দিয়ে দিন। কোনও রকম গোলমাল করবার মনোবলই নেই ওর এখন। আর বাকি ক'জনকে গ্রেফতার করা তো জলের মত সহজ। এই ব্যাপারে সমস্ত বাহাদুরি আমি নিজেই নিতে চাই।'

রানার হাতে হাতকড়া পরিয়ে চাবিটা দেয়া হলো শায়লার হাতে।

'ধন্যবাদ। আপনার সহযোগিতার কথা আমার বিস্তারিত রিপোর্টে দিল্লী পৌঁছবে।'

'সেটা আপনার দয়া,' হাত কচলে বলল এস.পি. বিগলিত কণ্ঠে।

'এখন আরেকটা জিনিস দরকার আমার। গর্ত থেকে ইঁদুরগুলোকে বের করতে খানিকটা ধোঁয়ার প্রয়োজন হতে পারে। একটা অটোমেটিক কারবাইন আর গোটা কয়েক হ্যাণ্ড গ্রেনেড তুলে দিন জীপে।'

এস.পি.-র ইঙ্গিতে দ্বিতীয় লোকটাও চলে গেল ঘর থেকে দ্রুত পায়ে। অল্পক্ষণের মধ্যেই রানাকে ধাক্কা দিয়ে ওঠানো হলো গাড়ির পিছন সীটে। স্টিয়ারিং ধরল শায়লা। সাঁ করে বেরিয়ে গেল জীপটা ইলোরের পুলিস হেড কোয়ার্টারের গেট দিয়ে।

বেশ খানিকটা গিয়ে মুখোশটা একটানে খুলে ফেলল শায়লা। বলল, 'ছি! বিচ্ছিরি গন্ধ এই মুখোশে। আর মাগো, কী ভয়ঙ্কর মেয়েলোকটার মুখের চেহারা!' শিউরে উঠল শায়লা ললিতার চেহারা কল্পনা করে।

'তোমার আব্বা কোথায়?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'তোমার জন্যে দুইঘণ্টা অপেক্ষা করে আধমাইল ভিতরে সরে গিয়েছিলাম আমরা। ফিরতে না দেখেই বুঝেছি আমরা কোন বিপদে পড়েছ তুমি।'

'কিন্তু আমি কোথায় আছি জানলে কি করে তুমি?'

'সাদেক খানকে দিয়ে খুঁজিয়েছি। ও-ই খুঁজে বের করেছে তোমাকে...'

'সাদেক খান!' হঠাৎ বুঝতে পারল রানা। শায়লার কপাল আর গালের দিকে দৃষ্টি গেল ওর। 'গোলমাল হয়েছিল কিছু?'

'তেমন কিছু না,' একটু দ্বিধা করে বলে ফেলল, 'হঠাৎ আক্রমণ করে বসেছিল ও আমাকে। আব্বাজী একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে না ঠেকালে, মেরেই ফেলত। হাত-পা বেঁধে নিয়ে আবার একটা স্টিমুল্যাণ্ট ইঞ্জেকশন দিয়ে জাগানো হয়েছে ওকে। তোমার আর ললিতার চিন্তা ওর মুখ থেকে শুনে সব ব্যাপার জানতে পারলাম আমরা। আরও জানতে পারলাম কবীর চৌধুরীর ভয়ে ভেতর ভেতর থরহরিকম্প হয়ে রয়েছে ললিতা বটব্যাল।'

পাকা সড়ক ছেড়ে জঙ্গলের একটা সরু পথ ধরে চলল এবার গাড়িটা। রাস্তার পাশে একটা লরীর বনেট খুলে এঞ্জিন পরীক্ষা করছে ড্রাইভার- কৌতূহলী দৃষ্টিতে চেয়ে দেখল সে রানাদের।

'কিন্তু এত তাড়াতাড়ি শহরে পৌঁছলে কি করে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'হেঁটে গেলে তো আধঘণ্টার পথ।'

'একটা কাঠ বোঝাই টস্যাকের পেছনে উঠে পড়েছিলাম। জানতাম, দেরি করলে আর তোমাকে বাঁচানো যাবে না। শহরে নেমেই ছুটে গিয়ে

একটা পাবলিক টেলিফোন বুদ থেকে ফোন করলাম পুলিস হেডকোয়ার্টারে, বললাম, আমি কবীর চৌধুরীর প্রাইভেট সেক্রেটারি বলছি; এক্ষুণি কর্নেল ললিতা বটব্যালের সঙ্গে কথা বলতে চান কবীর চৌধুরী, অত্যন্ত জরুরী ব্যাপার, এই মুহূর্তে যেন ডেকে দেয়া হয় তাকে।' হাসল শায়লা। 'জানতাম এস.পি.-র ঘরে আছে টেলিফোন, ঘরটা চেনা ছিল- দ্বীপে যাবার আগে আমাদের রিপোর্ট করতে হয়েছিল ইলোর পুলিস হেডকোয়ার্টারে- আর এ-ও জানতাম ফোনটা ধরবার সময় ওই ঘরে একা থাকবে ললিতা। পেছন দিকের আঙিনাটা ডিঙিয়ে উঁকি দিলাম এস. পি.-র ঘরের জানালা দিয়ে। ঘর খালি। জানালা টপকে লুকিয়ে পড়লাম কপাটের আড়ালে টেবিলের ওপর থেকে হান্টারটা তুলে নিয়ে। তারপরের ঘটনা তো তুমি জানোই।'

সাফল্যের স্মিথ হাসি শায়লার মুখে। হাতকড়া খুলে দিল সে রানার। বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল রানা দুঃসাহসী মেয়েটার দিকে। এমন সহজভাবে কথাগুলো বলে গেল, যেন রানাকে নি িত মৃত্যুর হাত থেকে জ্যান্ত ফিরিয়ে আনা এমন কিছুই কঠিন কাজ ছিল না।

'এই বিপদের মুখে যাচ্ছ দেখে বাধা দেননি ডক্টর ফৈয়াজ?'

'আব্বা বাধা দেবেন কেন?' আ র্য হলো শায়লা। 'তুমি চেনো না আব্বাকে। এই সমস্ত প্ল্যানই তো আব্বার। উনিই তো পাঠালেন আমাকে।'

গাড়ি থামাল শায়লা। একটা ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন ডক্টর ফৈয়াজ। একগাল হাসি তাঁর মুখে। এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরলেন দু'জনকে দুই হাতে।

'দেখলি, শায়লা, বলেছিলাম না এত সহজে মৃত্যু হবে না মাসুদ রানার! শুধু শুধুই কেঁদে ভাসাচ্ছিলি তুই। খোদা বলে একজন আছে তো মাথার ওপর...'

'কেঁদে ভাসাচ্ছিল!' ভ্রু কুঁচকে চাইল রানা শায়লার মুখের দিকে।

'যাহ্। আব্বাজী বলল আর অমনি বিশ্বাস করলেন উনি।' লজ্জায় লাল হয়ে গেল শায়লার গাল। 'আমি কাঁদিনি।'

'হ্যাঁ, কেঁদেছিস!' চেপে ধরলেন বদ্ধ।

'না, কাঁদিনি।'

'হ্যাঁ, কেঁদেছিস!'

'ওর জন্যে কাঁদিনি।'

'তবে কার জন্যে শুনি?'

'কারও জন্যে না। ইচ্ছে হয়েছে কেঁদেছি, ব্যস।'

হাসিমুখে বাপ-বেটির তর্কাতর্কি শুনল রানা, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'সার্চ পার্টি কতদূর?'

'আরও আধমাইল আছে,' বললেন বদ্ধ। 'এক্ষুণি রওনা হওয়া দরকার।

কিন্তু যাব কোনদিকে আমরা?'

স্পুলিসের গাড়ি যখন পাওয়া গেছে, রোড ব্লক এড়ানো যায় কি-না দেখি চেষ্টা করে,' বলল রানা।

সাদেক খানকে তোলা হলো জীপের পিছনে। ডক্টর ফৈয়াজকেও তুলে বসিয়ে দিল রানা পিছনের সীটে। ওঁর কাজ পিছন দিকে নজর রাখা। অটোমেটিক কারবাইন আর হ্যাণ্ড গ্রেনেড নিয়ে রানার পাশে তৈরি থাকবে শায়লা। রানা চালাবে গাড়ি।

হঠাৎ একটা শব্দ শুনে খাড়া হয়ে গেল রানার কান।

'গাড়ির এঞ্জিন!' বলল শায়লা।

একলাফে উঠে বসল রানা ড্রাইভিং সীটে। ওরা যে পথে এসেছে সেই পথে বিশ গজ তফাতে মোড় ঘুরছে একটা ল্যাণ্ডরোভার।

'এস.পি.!' চিৎকার করে বললেন ডক্টর ফৈয়াজ। স্পাশে বসে আছে ললিতা বটব্যাল। কয়েকজন পুলিসও আছে।'

'এদিক দিয়ে সোজা গেলে কি বড় রাস্তায় পড়া যাবে?' জিজ্ঞেস করেই বুঝতে পারল রানা, উত্তরটা এদের কারও জানবার কথা নয়। রাস্তাটা যেখানেই গিয়ে মিশুক, এই পথেই যেতে হবে এখন। ছুটল সে সামনের দিকে। 'জংলা পথে ওদের কাটিয়ে দিতে পারলে হয়।'

সাব-মেশিনগান গর্জে উঠল পিছনের জীপ থেকে। কয়েকটা ফুটো হয়ে গেল ক্যানভাসে।

'শুয়ে পড়ুন!' বলল রানা পিছনে না ফিরে। টিপে ধরল অ্যাক্সিলারেটার যতটা যায়। স্পীডমিটারের কাঁটা উঠতে থাকল ওপরে। হঠাৎ ডান দিকে একটা বাঁক দেখতে পেল রানা। সোজা না গিয়ে মোড় নিল সে ডাইনে। একটু দেরি হয়ে গেল মোড় নিতে। প্রকাণ্ড একটা গাছের সাথে ধাক্কা খেতে যাচ্ছে গাড়িটা। অ্যাক্সিলারেটার টিপে রেখেই বাঁ পায়ে ব্রেক চাপল রানা। স্কিড করে জীপের পিছন দিকটা বাঁয়ে চলে এল খানিকটা। মৃদুভাবে ধাক্কা খেল একটা মাটির ঢিবিতে। ব্রেক ছেড়ে দিতেই সোজা ছুটল গাড়ি রাস্তা ধরে। আবার বাঁয়ে মোড়। সেকেণ্ড গিয়ার দিতেই গর্জন করে উঠল জীপের শক্তিশালী এঞ্জিন। মোড় ঘুরবার ফাঁকে দুটো গুলি ছুঁড়ল শায়লা কারবাইন থেকে।

সামনের রাস্তাটা চওড়া হলো একটু, ক্রমেই উঁচু হয়ে যাচ্ছে এঁকেবেঁকে। হঠাৎ দেখতে পেল রানা সামনে খাদ। ভুল পথে এসেছে সে। ডানধারে কয়েক হাত নিচে দেখা যাচ্ছে ঠিক রাস্তাটা। ছোট ছোট ঝোপ ঝাড় রয়েছে ঢালু জায়গাটায়। ল্যাণ্ডরোভারটা রাস্তা ভুল করেনি, ছুটে আসছে সেটা ফুলস্পীডে। আর চিন্তা করবার সময় নেই, পাগলের মত স্টিয়ারিং কাটল রানা ডানদিকে। ঝোপঝাড় মাড়িয়ে এগিয়ে চলল জীপ, শেষের তিনফুট প্রায়

খাড়াভাবে লাফিয়ে নামল সেটা রাস্তার ওপর। প্রাণপণে বাঁয়ে কাটল রানা স্টিয়ারিং। গর্জে উঠল পিছন থেকে সাব মেশিনগান। জবাব দিল শায়লা অটোমেটিক কারবাইন দিয়ে।

রানার কানের পাশ দিয়ে ঠুস করে সামনের উইণ্ডস্ক্রীনটা ঝাপসা চৌচির করে দিয়ে বেরিয়ে গেল একটা বুলেট। স্পীড না কমিয়েই এক হাতে হুইল ধরে অন্যহাতে ভেঙে ফেলল রানা সামনের কাঁচ।

আবার উঁচুতে উঠছে জংলা পথ। বেশ অনেকটা কাছে চলে এসেছে ল্যাণ্ডরোভার।

'একটা গ্রেনেড ফেলো, শায়লা,' বলল রানা চট্ করে একবার পিছন ফিরে চেয়ে।

ছাতের একটা রড ধরে বেশ খানিকটা বাইরে বেরিয়ে পিন্‌টা দাঁতে কেটে ছুঁড়ে মারল শায়লা পিছন দিকে। অনেকটা সামনে পড়ল গ্রেনেড। ব্রেক চাপল এস.পি.। ধোঁয়ায় ঢেকে গেল পিছনের রাস্তাটা।

'লেগেছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। একটু যেন আগে পড়ল বলে মনে হলো,' বললেন ডক্টর ফৈয়াজ। একটু থেমেই বললেন, 'নাহ্। লাগেনি। আবার দেখা যাচ্ছে জীপ।'

দ্বিতীয় গ্রেনেডটা ফাটলই না। রেগে গিয়ে দেহের অর্ধেকটা বাইরে বের করে তৃতীয় গ্রেনেডের পিন বের করল শায়লা দাঁত দিয়ে। তারপর ছুঁড়ে মারল পিছন দিকে। আয়নায় স্পষ্ট দেখতে পেল রানা ল্যাণ্ডরোভারের ঠিক সামনে দুই চাকার তলায় এখন ওটা।

হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠল শায়লা। রানা দেখল ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেছে শায়লার মুখ। রক্ত দেখতে পেল কনুইয়ের কাছে। বাম হাতটা ছেড়ে দিয়ে পড়ে যাচ্ছিল সে বাইরের দিকে। স্টিয়ারিং ছেড়ে দুই হাতে টেনে নিয়ে এল রানা ওকে ভিতরে। আরেকটা মোড় এসে গেছে, সামলাতে পারল না রানা। ব্রেক চাপল প্রাণপণে। সোজা গিয়ে একটা মোটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে গুঁতো খেল জীপ।

ঠিক সেই মুহূর্তেই ফাটল শায়লার হ্যাণ্ড গ্রেনেড। শূন্যে উঠে গেল ল্যাণ্ডরোভারের সামনের অংশটুকু। তারপর উল্টেপাল্টে গড়িয়ে পড়ে গেল গাড়িটা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে বিশ ফুট নিচে। দাউ দাউ করে আগুন ধরে গেল গাড়িতে। রাস্তার ওপর থেকে বিস্ফোরণের ধোঁয়াটা সরে যেতেই স্পষ্ট দেখতে পেল রানা ললিতা বটব্যালের বীভৎস মুখ। বিস্ফোরণের আগেই লাফিয়ে নেমে গিয়েছিল সে গাড়ি থেকে- এখন মাথা উঁচু করে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে রানার দিকে। এমনি সময় চোখ পড়ল রানার লরীটার ওপর। এতক্ষণ দেখতে পায়নি ওরা- জীপের পিছন পিছন এতক্ষণ ধরে আসছিল

সৈন্যভর্তি একটা মিলিটারি লরী।

এঞ্জিন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল- গিয়ার নিউট্রাল করে আবার স্টার্ট দিল রানা। ব্যাক গিয়ার দিয়ে পিছিয়ে এল কয়েক হাত। তারপর ছুটল আবার।

'হাত ছাড়া আর কোথাও লেগেছে গুলি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'না,' জবাব দিল শায়লা। 'মারাত্মক কিছু নয়, এদিক দিয়ে ঢুকে ওদিক দিয়ে বেরিয়ে গেছে।'

'পিছনে মিলিটারি লরী। থামতে পারছি না যে!' বলল রানা।

'থামতে হবে না,' বললেন ডক্টর ফৈয়াজ। 'আমি তিন মিনিটে ব্যাণ্ডেজ করে দিচ্ছি।' মেডিকেল কিট খুলে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বের করে ফেলেছেন তিনি ততক্ষণে। 'আয় তো মা, এপাশে চলে আয়।'

জঙ্গলের আঁকাবাঁকা পথ ছেড়ে বড় রাস্তায় উঠে এল জীপ। ডান দিকে পঁচিশ মাইল গেলেই রাজামুন্দ্রি। টপ গিয়ারে দিয়ে অ্যাক্সিলারেটার পুরো টিপে ধরে পিছন ফিরে চাইল রানা। ডক্টর ফৈয়াজের বুকে মাথা রেখে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে চুপচাপ পড়ে আছে শায়লা।

'এখন কেমন বোধ করছ, শায়লা?'

'ভাল। হাতে কোন অনুভূতিই নেই, কাজেই ব্যথাও নেই।'

সামনেই রোড ব্লক। একটা বাঁশ দিয়ে বন্ধ করা হয়েছে রাস্তা। কয়েকজন সশস্ত্র সৈন্য দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার দুই পাশে। হঠাৎ মাথায় বুদ্ধি এল, সাইরেনের বাটনটা টিপে দিল রানা, গাড়ির গতি কমাল না একটুও।

কাজ হলো সাইরেনে। পুলিসের জীপ সাইরেন বাজাতে বাজাতে ফুলস্পীডে আসছে, নিশ্চয়ই জরুরী কোন ব্যাপারে যাচ্ছে। বাঁশ তুলে দিল একজন। একরাশ ধুলো উড়িয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেল জীপটা ওদের সামনে দিয়ে।

একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হলো রানা- রাস্তার ওপর যে-সব চেক পোস্ট বসানো হয়েছে সেগুলোকে এখনও ওয়্যারলেসে জানানো হয়নি যে পুলিসের জীপ নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে ওরা। খুব সম্ভব জ্ঞান ফিরে আসতেই এস.পি.-কে নিয়ে ছুটেছে ললিতা রানাদের পিছনে, খবর দেবার সময় পায়নি।

কিন্তু আসলে খবর দেয়ার যে কোন প্রয়োজনই ছিল না সেকথা বুঝতে পারল রানা অল্পক্ষণের মধ্যেই। দু'ধারে পাহাড়ী জঙ্গল, শাল পিয়াল মহুয়ার গাছ, মাঝখান দিয়ে মসৃণ পীচ ঢালা সড়ক। মাঝে মাঝে পাহাড়ের গা বেয়ে উঁচুতে উঠে যাচ্ছে পথটা, আবার নেমে আসছে ঢাল বেয়ে। কালো মেঘ জমে মুখভার হয়ে আছে আকাশের। হু-হু করে ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকছে ভাঙা উইণ্ডস্ক্রীন দিয়ে। আর পনেরো মাইল যেতে পারলেই হয়। নদী পেরোলেই রাজামুন্দ্রি। নদীটা পেরোবার দরকার নেই। জীপটা কোথাও লুকিয়ে রেখে নৌকো জোগাড় করে নিতে হবে ওকে। সেটা খুব বেশি অসুবিধা হবে না। শুধু

জলপুলিসের হাত থেকে বাঁচবার কোন কৌশল বের করতে হবে।

ঠিক এমনি সময় লাফিয়ে উঠল রাস্তাটা রানার চোখের সামনে। বিশ গজ সামনে পড়েছে বোমাটা। ব্রেক চাপল রানা। মস্ত একটা গর্ত সৃষ্টি হয়েছে রাস্তার মধ্যেখানে। গাড়ি নিয়ে গর্ত ডিঙিয়ে ওপাশে যাওয়ার উপায় নেই। মাথার উপর দিয়ে গাড়িটার পিছনে চলে গেল হেলিকপ্টার। গর্তের কাছে এসে থেমে গেল জীপ। বিশ গজ পিছনে পড়ল দ্বিতীয় বোমা। এইবার ধীরে ধীরে নামছে হেলিকপ্টার নিরাপদ দূরত্বে।

সাদেক খানের বাহু থেকে সূচটা বের করে নিয়ে মেডিকেল কিটের মধ্যে সিরিঞ্জ পুরে রাখলেন ডক্টর ফৈয়াজ। বললেন, 'ওরা রাস্তাটা ধ্বংস করছে, গাড়িটা নয়।'

'হ্যাঁ। গাড়িতে সাদেক খান আর আপনি না থাকলে শুধু শুধু রাস্তা নষ্ট করত না- গাড়িতেই ফেলত বোমা।' তিক্তকণ্ঠে বলল রানা কথাগুলো। কালো হয়ে গেছে ওর মুখ পরাজয়ের গ্লানিতে। অটোমেটিক কারবাইনটা পাশের সীট থেকে তুলে নিয়ে নেমে পড়ল রানা জীপ থেকে। 'জলদি, সবাই নামো গাড়ি থেকে।'

সবচেয়ে আগে নামল সাদেক খান। টকটকে লাল চোখে ভীত দৃষ্টিতে এদিক ওদিক চাইতে চাইতে, শায়লা নামল হুইল চেয়ারটা হাতে নিয়ে, ডক্টর ফৈয়াজকে কোলে তুলে নামিয়ে বসিয়ে দিল রানা চেয়ারে। কিন্তু যাবে কোন্ দিকে? দু'পাশে উঁচু পাহাড়। হেলিকপ্টারটাকে কোথাও দেখতে পেল না রানা।

'আসছে!' রানার কানের কাছে ফিসফিস করে বলল সাদেক খান। 'আসছে ওরা! অনেক লোক!'

'কোথায়?' বলেই চোখ পড়ল রানার পিছন দিকে। ধোঁয়া সরে গেছে রাস্তার ওপর থেকে। তিন ট্রাক বোঝাই সৈন্য এসে দাঁড়িয়েছে পিছনের গর্তটার সামনে। ট্রাকের ওপর থেকে তিনটে স্প্যানডাউ মেশিনগান স্থির হয়ে আছে ওদের দিকে মুখ করে। ঝপাং ঝপাং লাফিয়ে নেমে পড়েছে স্টেনগান হাতে জনা চল্লিশেক সৈন্য, ছড়িয়ে পড়েছে ওরা রাস্তাটা জুড়ে। অর্ধেক সৈন্য উঠে যাচ্ছে দু'পাশের পাহাড়ে জীপটাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলার জন্যে।

রানা বুঝল এখন একটা গুলি করলেই দুই সেকেণ্ডে মৃত্যু ঘটবে ওদের সব কয়জনের। কিছুই করবার নেই এখন আর আত্মসমর্পণ ছাড়া। জিভটা শুকিয়ে গেল ওর।

'কারবাইন ফেলে দাও মাটিতে!' তীক্ষ্ণ নারী কণ্ঠে আদেশ এল। রানা চেয়ে দেখল একটা ট্রাক থেকে নেমে আসছে ললিতা বটব্যাল। ডানহাতে পিস্তল ধরা, বাম হাতটা ব্যাণ্ডেজ করে ঝোলানো আছে গলায় বাঁধা ফিতের ওপর।

ম্লান ভাবে হাসল রানা। ললিতার হাতেই মৃত্যু লেখা ছিল ওর। হঠাৎ ভাবল, দেবে নাকি শেষ করে? তাহলে সবাই মারা পড়বে, কিন্তু মারা তো এমনিতেও পড়বে, কাউকেই জ্যান্ত রাখবে না ওরা, কাজ ফুরালেই মেরে ফেলবে। দেবে সে ললিতাকে খতম করে? বহুকষ্টে সংযত করল রানা নিজেকে। ডক্টর ফৈয়াজ আর শায়লাকে এক্ষুণি হত্যা করবে না ওরা- হয়তো ওদের মুক্তির অন্য কোনও সুযোগ আসতেও পারে এর মধ্যে... রানার কোন অধিকার নেই নিজের ভাগ্যের সঙ্গে ওদের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেয়ার। হাত থেকে ফেলে দিল সে কারবাইন।

'আত্মসমর্পণ করলে, রানা?' বলে উঠলেন বিস্মিত বৈজ্ঞানিক।

'হ্যাঁ?' চাপা কণ্ঠে বলল রানা। 'আমার মৃত্যুতেই সব শেষ হয়ে যাবে না, ডক্টর ফৈয়াজ। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করবেন। দেখবেন আবার একজন আসবে পাকিস্তান থেকে, আবার সুযোগ পাবেন আপনারা পালিয়ে যাবার। দোয়া করি, আমার চেয়ে ভাল ভাগ্য নিয়ে যেন আসে সেই লোক। আমি পারলাম না, শুধু শুধুই কষ্ট দিলাম আপনাদের, কিন্তু দেখবেন, আমার পরে যে আসবে সে ঠিক পারবে।'

যেন বহুদূর থেকে বলছে রানা কথাগুলো। অদ্ভুত নরম শোনাল ওর কণ্ঠস্বর। ডুকরে কেঁদে উঠল শায়লা। মৃদুহাসি ফুটে উঠল রানার ঠোঁটে। বলল, 'এখন বুঝলাম, সকালে আমারই জন্যে কেঁদেছিলে তুমি, শায়লা।'

এসে গেছে সৈন্যরা। কলার ধরে এক হ্যাঁচকা টান মেরে মাটিতে ফেলে দিল ওরা রানাকে। দড়াম করে পাঁজরের ওপর লাথি পড়ল একটা। আরেকজন লাথি চালাল ওর মুখ লক্ষ্য করে। চুল টেনে দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো ওকে আবার। সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ললিতা বটব্যাল।

'এই তিনটেকে ট্রাকে নিয়ে যাও,' হুকুম দিল ললিতা। 'আর ঘটোৎকচ কোথায় গেল, ডাকো ওকে। গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়াও তোমরা।'

ছেঁচড়ে টেনে নিয়ে গেল তিনজন লোক শায়লা, ডক্টর ফৈয়াজ আর সাদেক খানকে। রানা বুঝল এটাই ওর বধ্যভূমি। গোল করে ওকে ঘিরে দাঁড়াচ্ছে স্টেনগান হাতে সৈন্যদল। কয়েকজন লোকের মাথার ওপর দিয়ে ঘটোৎকচের বেল-মাথা দেখতে পেল রানা। সগর্বে উঁচু হয়ে রয়েছে মাথার ওপর টিকিটা। এগিয়ে এল ঘটোৎকচ। ওর প্রকাণ্ড ধড়টার পাশে সেনাবাহিনীর স্বাস্থ্যবান লোকগুলোকেও নিতান্তই দুর্বল লাগছে দেখতে।

ঘটোৎকচের বিশাল, বিপুল চেহারাটার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে চাইল ললিতা।

'শুনলাম মাদ্রাজের সেরা কুস্তিগীর তুমি, তাই সঙ্গে এনেছি তোমাকে ঘটোৎকচ। বাচ্চা ছেলেরা যেমন ফড়িং-এর পাখা ছেঁড়ে তেমনি করে এর হাত-পা ছিঁড়ে ফেলতে হবে তোমার। কি, পারবে না?'

হাসি ফুটে উঠল ঘটোৎকচের মুখে। দিনের আলোয় এত লোকজনের মধ্যে সবরকমের ভয়-ভীতি কাটিয়ে উঠেছে সে। মাথা নাড়ল রানার দিকে চেয়ে।

'কিন্তু এই লোকটাও খুবই শক্তিশালী। বাইরে থেকে দেখে বুঝবার উপায় নেই। ওকেও সুযোগ দেয়া হবে আত্মরক্ষার। প্রাণপণে যুদ্ধ করবে ও, খেয়াল রেখো। আরও একটা কথা। বেমক্কা কোথাও মেরে হঠাৎ খুন করে ফেলো না- রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করতে চাই আমি ওর মৃত্যুটা।'

রানা বুঝল, এই দৈত্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে ওর। মাদ্রাজের সেরা কুস্তিগীর। জোরে ওর সঙ্গে পারার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। রানার একমাত্র অস্ত্র জুজুৎসু এবং কারাতের মাঝারি গোছের দক্ষতা। তাতে কি কাজ হবে?

হাফপ্যান্ট খুলে ল্যাংগোঠটা আরেকটু এঁটে নিল ঘটোৎকচ। ভীমের গদার মত দুই ঊরুতে চাপড় দিল দুটো। প্রস্তুত হয়ে নিল রানাও। বুঝল, প্রথম কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই জয় পরাজয় নির্ধারিত হয়ে যাবে।

গোল হয়ে ঘুরতে আরম্ভ করল ওরা দু'জন হাত দুটো সামনে বাড়িয়ে ঘাড়টা একটু কুঁজো করে। রানার গতিবিধি দেখেই টের পেল ঘটোৎকচ, এ লোককে চিৎ করা সহজ হবে না, বিদ্যুতের মত দ্রুত এর চালচলন।

হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়িয়ে কারাত যুদ্ধের ভঙ্গিতে চিৎকার করে উঠল রানা, 'কি...ইয়া!' দেহের সমস্ত পেশী টান হয়ে গেছে ওর। পরমুহূর্তেই আঙুলগুলো সোজা রেখে লাফিয়ে এসে প্রচণ্ড একটা দাও চালানো কারাতের কোপ মারল সে ঘটোৎকচের ঘাড়ের ওপর। সেইসঙ্গে বাম হাঁটুটা ভয়ানক এক গুঁতো মারল ওর তলপেটে।

হঠাৎ চিৎকার শুনে আধ সেকেণ্ডের জন্যে হকচকিয়ে গিয়েছিল ঘটোৎকচ, আঘাত ফেরাবার উপায় ছিল না ওর। জবাইয়ের খাসীর মত গগনভেদী এক আর্তনাদ করে ধড়াশ করে পড়ল সে চিৎ হয়ে- পড়ার আগেই নাকের হাড়টার ঠিক নিচে কারাতের একটা আপার কাট ঝেড়ে দিয়েছে রানা।

গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে ঘটোৎকচের নাক দিয়ে। কয়েক ঘণ্টার জন্যে ওকে সম্পূর্ণ অকেজো করে দিতে হলে নিয়ম মাফিক স্পাইনাল কর্ড আর ক্রোনিয়ামের জংশনে আরেকটা আঘাত করতে হয়। টিকির গোছা ধরে টান দিল রানা, টিকি ছিঁড়ে এল, কিন্তু নড়ানো গেল না ওকে একচুলও। নিশ্চিন্তে জ্ঞান হারিয়েছে প্যাহেলওয়ান।

'দাঁড়াও!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল ললিতা। ঠুন করে একটা শব্দ হতেই চেয়ে দেখল রানা একটা তরল পদার্থ ভর্তি কাঁচের জারের সীল করা মুখটা ভেঙে ফেলেছে ললিতা পিস্তলের নল দিয়ে টোকা মেরে। পিস্তলটা পিঙে ঝোলানো বাম হাতে চলে গেছে ওর, অ্যাসিডের জারটা ডানহাতে।

এগিয়ে এসেছে সে কয়েক পা। ‘আমারই ভুল হয়েছিল ওকে তোমার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করা। এসো, এবার আমার সঙ্গে এসো।’

ঠিক তিন হাত দূরে দাঁড়িয়ে কাঁচের জারটা তুলল ললিতা, রানার মুখ লক্ষ্য করে।

এগারো

বেলজিয়ামের ফেব্রিক ন্যাশনালের তৈরি করা থ্রী-টু ক্যালিবার, স্ট্রেট ব্লো ব্যাক অ্যাকশন, হ্যামারলেস্ ব্রাউনিং পিস্তলটা গর্জে উঠল দু’বার। ঠুস করে ফাটল কাঁচের জারটা- সব অ্যাসিড পড়ে গেল মাটিতে, ছিটকে পাঁচ হাত দূরে পড়ল ললিতার হাতে ধরা পিস্তলটা। দ্বিতীয় গুলিটা ওর বাম বাহুর বেশ খানিকটা মাংস ছড়ে দিয়ে বেরিয়ে গেছে। ব্যথায় কুঁচকে গেছে ললিতার বীভৎস মুখ।

চম্‌কে চাইল সবাই পাহাড়ের দিকে। একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ধোপদুরস্ত জামা-কাপড় পরা সাড়ে ছয়ফুট লম্বা একজন লোক। চওড়া কাঁধ, প্রকাণ্ড মাথা, মাথা ভর্তি ব্যাকব্রাশ করা কোঁকড়া চুল। পিস্তলটা শোল্‌ডার হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখছে লোকটা এখন। প্রথম দর্শনেই চিনতে পারল রানা- কবীর চৌধুরী! পাশেই দাঁড়িয়ে আছে ইণ্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের বর্তমান অ্যাসিস্ট্যান্ট-চীফ জেনারেল গোবিন্দ রাজলু। সামরিক ইউনিফরম তার পরনে।

ধীরে ধীরে নেমে এল কবীর চৌধুরী এবং গোবিন্দ রাজলু। খটাখট বুটের শব্দ তুলে স্যালুট করল সিপাইগুলো।

‘আপনি…আপনি এখানে এলেন কি করে!’ ভীত কণ্ঠে বলল ললিতা।

কয়েক সেকেণ্ড ললিতার ভয়ঙ্কর মুখের দিকে চেয়ে রইল কবীর চৌধুরী। কোন উত্তর না দিয়ে ফিরল রানার দিকে।

‘মাসুদ রানা! বহুদিন পর দেখা। চিনতে পারো? মনে আছে রাঙামাটির পাহাড়ের নিচে সেই বিস্ফোরণের কথা? আমার সারা জীবনের সাধনা, অক্লান্ত পরিশ্রমকে পণ্ডশ্রমে পরিণত করেছিলে তুমি। বুক কাঁপছে না আমাকে দেখে?’

‘না। আমি অন্যায় প্রতিরোধ করেছিলাম। তখন বুক কাঁপেনি, এখন কাঁপবে কেন? মৃত্যুর বেশি তো আর কিছু হতে…’

স্পারে। তার চেয়েও ভয়ঙ্কর অনেক কিছু আছে এই পৃথিবীতে। এ

ব্যাপারে পরে আলাপ করা যাবে, আপাতত কয়েকটা কাজ সেরে নিই। নাও, শুরু করো, রাজলু।'

'একে খুন করবার অধিকার কে দিয়েছে তোমাকে, কর্নেল বটব্যাল?'

'একে বন্দী করে ক্লিনিকে নিয়ে যাচ্ছিলাম, স্যার, ও পালাবার চেষ্টা করেছিল তাই...'

'আমি নিজের চোখে সব দেখেছি, কর্নেল।'

'আমি লিখিতভাবে এক্সপ্লেনেশন দেব, স্যার। আমি...আসলে...'

'থাক। এখন কিছু শুনতে চাই না আমি। সাদেক খান আর ডক্টর ফৈয়াজ কোথায়?'

'ট্রাকে। ক্লিনিকে ফেরত নিতে যাচ্ছিলাম আমি ওদের।'

'এই টিলার ওপাশে আমার হেলিকপ্টারে তুলবার আদেশ দাও ওদেরকে। তোমাকেও অ্যারেস্ট করে নিয়ে যেতাম, কিন্তু জায়গা হবে না। কম্পিউটার ধ্বংস থেকে শুরু করে বারোটা চার্জ আছে তোমার বিরুদ্ধে- ইলোরে ফিরে উপযুক্ত কৈফিয়ৎ তৈরি করবার চেষ্টা করো গিয়ে ঠাণ্ডা মাথায়। মাসুদ রানাকে নিয়ে যাচ্ছি আমরা ক্লিনিকে।'

'কিন্তু স্যার...যদি আমাকে...' কিছু বলতে যাচ্ছিল ললিতা সেদিকে কর্ণপাত না করে ঘুরে দাঁড়াল গোবিন্দ রাজলু।

'ওই ওপাশ দিয়ে একটা ভাল রাস্তা আছে। চলো, চৌধুরী, একটু ঘুরেই যাই। আসুন মেজর মাসুদ রানা, ক্লিনিকে ফিরে যেতে হবে আপনাকে আজ রাতের জন্যে। কাল সকালে নিয়ে যাওয়া হবে আপনাকে নয়াদিল্লী। অনেক কথা জানবার আছে আমাদের, কি বলো, চৌধুরী?'

নিবিষ্ট চিত্তে সিগারেট টানছে কবীর চৌধুরী, মুচকি হাসল একটু।

ছোট লঞ্চটা দাঁড়িয়ে আছে ঘাটে। হেলিকপ্টার সবাইকে নামিয়ে দিয়ে গোবিন্দ রাজলুকে নিয়ে চলে গেল হায়দ্রাবাদ। বিকেল সাড়ে পাঁচটা। সারাদিন সূর্যের মুখ দেখা যায়নি একটিবারও। কালো মেঘে ছেয়ে আছে আকাশ। দূরে আবছা মত দেখা যাচ্ছে ওঙ্কার দ্বীপ। বাতাসের বেগ বেড়েছে, বড় বড় ঢেউ উঠছে দু'শো চল্লিশ বর্গমাইল জোড়া প্রকাণ্ড কোলায়ের লেকের গভীর হৃদয় মন্থন করে। ঢেউয়ের মাথায় সাদা ফেনা। রানা ভাবল ঝড় আসবে না তো আবার?

বাম পা-টা সামান্য টেনে টেনে লঞ্চে উঠল কবীর চৌধুরী রানার পিছন পিছন।

'আমাদের ক্লিনিকে ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ললিতার প্রতিহিংসা থেকে রক্ষা করবার জন্যে। শহরে রাখা মোটেই নিরাপদ হত না। কাল সকালে দিল্লী থেকে জেট এসে নামবে ইলোর এয়ার স্ট্রিপে। তাতে করেই তোমাদের নিয়ে যাওয়া হবে দিল্লী।'

'শুধু আমাকে, না ডক্টর ফৈয়াজদেরও?'

'সবাইকে।'

'কেন? কম্পিউটারের শখ মিটে গেছে তোমাদের?'

'না। রিসার্চ চলবে এবার দিল্লীতে। এই দ্বীপটা খালি করা হচ্ছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। তোমার বোমাটা ফাটতেই বোঝা গেছে এতবড় প্রজেক্টের পক্ষে ভয়ঙ্কর ছিল ওঙ্কার দ্বীপ।

'ভয়ঙ্কর ছিল মানে?'

'কয়েক দিনের মধ্যে ডুবে যাবে দ্বীপটা পানির তলায়। কম্পিউটার রূম থেকে প্রচণ্ড বেগে পানি উঠছে ওপরে। কয়েকটা ফাটল সৃষ্টি হয়েছে পুরো দ্বীপটার বুক চিরে। দ্রুত ইভাকুয়েট করা হচ্ছে দ্বীপ।'

ঠিক সাড়ে ছয়টায় পৌঁছল লঞ্চ ওঙ্কার দ্বীপে। পুরো চব্বিশ ঘণ্টাও হয়নি, মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল রানা এখান থেকে বেরিয়ে। কপাল খারাপ, আবার আসতে হলো ফিরে। লক্ষ করল রানা দ্বীপের ওপর গার্ড এবং লোকজনের স্বল্পতা। লম্বা সার বাঁধা ব্যারাকগুলো অন্ধকার। ল্যাবরেটরি এলাকার দুটো গেটই খোলা। একটা গার্ড কেবল দাঁড়িয়ে আছে দ্বিতীয় গেটে।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ব্লকের ধ্বংসাবশেষ ভৌতিক দেখাচ্ছে। আশপাশের কয়েকটা দালানেরও দরজা জানালা পোড়া। জানালার কাঁচগুলো ভেঙে গেছে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ঝাঁকুনিতে।

এগিয়ে এল ক্যাপ্টেন খান্না।

'স্বাগতম, মাসুদ রানা, ডক্টর ফৈয়াজ। যেখানকার জল সেখানেই এলেন ফিরে- মাঝের এই দৌড়াদৌড়ির সত্যিই কোন প্রয়োজন ছিল কি? আসুন, আপনাদের ঘরে পৌঁছে দিই।'

ক্যাপ্টেন খান্নার হাতে ওদের ছেড়ে দিয়ে কবীর চৌধুরী চলে গেল ওর নির্দিষ্ট ঘরে। একটা খালি ওয়ার্ডে নিয়ে এল খান্না রানাদের। সুইচ টিপতেই ম্লান হলুদ আলো জ্বলে উঠল ঘরের মধ্যে।

'আমাদের এঞ্জিনিয়াররা সবাই চলে গেছে দ্বীপ ছেড়ে- ইমার্জেন্সী জেনারেটারটা কেবল চালু আছে। আশাকরি এত কম আলোয় অসুবিধা হবে না আপনাদের। আমি খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি। ইচ্ছে করলে স্নান সেরে নিতে পারেন আপনারা। আর দয়া করে দ্বিতীয়বার পালাবার চেষ্টা করবেন না। দশজন গার্ড পাহারা দিচ্ছে এই ওয়ার্ডটা। যদি ওদের চোখে ধুলো দেয়া সম্ভব হয়ও, দ্বীপ ছেড়ে আজ আর কোথাও যাবার উপায় নেই। লঞ্চটা ফিরে গেছে পনেরোজন পেশেণ্ট আর দশজন স্টাফ নিয়ে- আজ রাতে আর আসবে না।'

'পেশেণ্টদেরও সরিয়ে ফেলা হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল শায়লা।

'বেশির ভাগই। শুধু ছয়জন বদ্ধ-পাগল খুনের আসামী রয়েছে, কাল সকালে পার করা হবে ওদের কড়া পাহারা দিয়ে। দ্বীপে এখন পাঁচজন মেইল নার্স, দশজন সশস্ত্র গার্ড আর আমরা ছাড়া কেউ নেই। কালই খালি হয়ে যাবে সব। যাক, আপনারা বিশ্রাম করুন, আধঘণ্টার মধ্যেই খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

সাদেক খানকে শুইয়ে দেয়া হয়েছে একটা বেডের ওপর। দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে ওর। ডক্টর ফৈয়াজ পরীক্ষা করে দেখছেন ওকে আর নৈরাশ্যব্যঞ্জক ভঙ্গিতে মাথা নাড়ছেন এদিক-ওদিক। ক্যাপ্টেন খান্না বেরিয়ে যেতেই রানার পাশে চলে এল শায়লা।

'অনেক চিন্তা করে দেখলাম, রানা। এখান থেকে পালানো অসম্ভব। কোনও উপায় নেই।' শায়লার কণ্ঠে হতাশা।

'এখনও তুমি পালাবার কথা ভাবছ?' বলল রানা মৃদু-হেসে। 'আরও কয়েকটা দিন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে তোমাদের। দিল্লীতে গবেষণা চলতে থাকুক, দেখবে ঠিক সময় মত পৌঁছে যাবে আমাদের লোক।'

'কিন্তু সেই লোকের জন্যে কান্না আসবে না যে!' টপটপ করে কয়েক ফোঁটা পানি পড়ল ওর গাল বেয়ে।

শায়লার একটা হাত তুলে নিল রানা নিজের হাতে। মৃদু চাপ দিল। তারপর চাপা স্বরে বলল, 'যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। চোখের পানি আগে থেকেই সব খরচ করে ফেলো না, শায়লা। হাল আমি ছাড়িনি। প্ল্যানও ঠিক বের করে ফেলব একটা। আচ্ছা, থিসিসের শেষের অংশটুকু কোথায় রেখেছেন তোমার আব্বা?'

'হুইল চেয়ারের ডানদিকের হাত রাখবার জায়গাটা ফাঁপা...'

হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন ডক্টর ফৈয়াজ।

'রানা! জলদি এসো এদিকে। শায়লা, সিরিঞ্জ নিয়ে এসো তাড়াতাড়ি।'

চোখ উল্টে গোঁ-গোঁ করছে সাদেক খান, উঠে বসবার চেষ্টা করছে। ওকে ধরে রাখতে পারছেন না ডক্টর ফৈয়াজ।

'কি হয়েছে ওর?' দুই কাঁধ ধরে বিছানার সাথে চেপে রেখে জিজ্ঞেস করল রানা।

'লোকটা বোধহয় মারাই যাচ্ছে, রানা। এমনিতে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে গিয়েছিল, তার ওপর ছয়-ছয়টা ইঞ্জেকশন পড়েছে আজ।'

ছুটে গিয়ে ওষুধ আর সিরিঞ্জ নিয়ে এল শায়লা। ইঞ্জেকশন পড়তেই ঝিমিয়ে এল সাদেক খান। ঘরে প্রবেশ করল কবীর চৌধুরী।

'এক্ষুণি লোকটাকে হাসপাতালে ভর্তি করা দরকার,' বললেন ডক্টর ফৈয়াজ।

'সেটা কোনমতেই সম্ভব নয়। কালকের আগে কিছুই সম্ভব নয়। দেখুন,

ততক্ষণ বাঁচিয়ে রাখতে পারেন কিনা।'

চট করে চাইল শায়লা রানার চোখের দিকে। অর্থাৎ, মাইক্রোফোন আছে এই ওয়ার্ডেও। ডক্টর ফৈয়াজের ডাক শুনেই ছুটে চলে এসেছে কবীর চৌধুরী, জানে, লোকটা মারা যাচ্ছে।

'আমার তো মনে হয় দুই ঘণ্টাও টিকবে কিনা সন্দেহ,' মাথা দোলালেন ডক্টর ফৈয়াজ।

'তাতে কি বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি আছে, ডক্টর ফৈয়াজ? ওর সাহায্য ছাড়াও তো আপনি তৈরি করতে পারেন কম্পিউটারটা, তাই না?'

স্পারব। কিন্তু অসুবিধে হবে।'

স্প্ল্যানের শেষের অংশটুকু কোথায়?'

'কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'ওটুকু পেয়ে গেলেই নিশ্চিন্তে এদের খুন করা যায়, তাই না? খবরদার, ডক্টর ফৈয়াজ! ওইটাই আপনার হাতের টেক্কা। ওটা আপনার হাত থেকে খসিয়ে নিতে পারলেই ওদের কাছে এক কানাকাড়ি মূল্যও থাকবে না আর আপনার।'

রানার দিকে চেয়ে মৃদু হাসল কবীর চৌধুরী। হঠাৎ মট করে ভেঙে ফেলল হুইল চেয়ারের একটা হাতল। ব্রাউনিং পিস্তলটা ধরা আছে রানার বুকের দিকে। বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে এক পা এক পা করে পিছিয়ে গিয়ে।

সংবিৎ ফিরে পেয়ে ধাওয়া করতে যাচ্ছিল রানা, বাধা দিল শায়লা।

'তোমার কোন দোষ নেই, রানা। কেন শুধু শুধু প্রাণ দেবে ওটার জন্যে। আব্বাজী, একটু আগে আমিই বলেছিলাম রানাকে থিসিসের শেষ অংশটা কোথায় আছে। এই ওয়ার্ডেও যে ওরা মাইক্রোফোন লাগিয়েছে বুঝতে পারিনি আমি।' ক্ষোভে বুজে এল শায়লার কণ্ঠস্বর।

শীর্ণ একটা হাত বাড়িয়ে শায়লার হাত ধরলেন বৃদ্ধ। শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'দুঃখ করিস নে, মা। কয়েকদিন এগিয়ে এল মৃত্যুটা, এছাড়া তো আর কিছুই ক্ষতি হয়নি।'

কোন ভরসাই আর রইল না। শায়লার মনে হলো মহাপ্রলয়ের আগের রাতে একসাথে জড়ো হয়েছে যেন ওরা তিনজন। মৃত্যু ওদের অনিবার্য। কোন আশা নেই- সম্পূর্ণ নিরুপায় ওরা। কোন অনুনয়, কোন প্রার্থনাই আর মঞ্জুর হবে না ওদের। মরতেই হবে। ফাঁসীর আসামীর ফাঁসীর ঠিক আগের রাতে কেমন অনুভূতি হয় বুঝতে পারল শায়লা। ডুকরে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করল ওর।

অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে। রাত এগারোটা। বিছানার ওপর এপাশ ওপাশ ফিরছে রানা কেবল, কিছুতেই কোন বুদ্ধি খেলছে না মাথায়। উদ্ভট সব প্ল্যান আসছে, যেগুলো বাস্তবায়িত করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।

এমনি সময় চিৎকার করে উঠল সাদেক খান। তড়াক করে খাট থেকে নেমে এগিয়ে গেল রানা। ছুটে এল শায়লাও। ডক্টর ফৈয়াজও আসছেন।

ছটফট করছে সাদেক খান। ফেনা বেরোচ্ছে মুখ দিয়ে। লাল চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে বাইরে।

'একজন গার্ডকে ডাকো, রানা। এক্ষুণি! ল্যাবরেটরি থেকে একটা ওষুধ আনতে হবে।'

ছুটে গিয়ে দরজায় টোকা দিল রানা জোরে জোরে। কোন সাড়া-শব্দ নেই। দরজার হাতল ধরে টান দিল রানা। আশ্চর্য, খুলে গেল দরজাটা! বেরিয়ে এল সে বাইরে। একজন গার্ড দরজার পাশে দেয়ালে হেলান দিয়ে ঘুমাচ্ছে।

কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিল রানা। 'ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পাহারা দিচ্ছ নাকি, হে।'

কোনও সাড়া নেই। কাঁধটা ছেড়ে দিতেই কাৎ হয়ে পড়ে গেল গার্ডটা মাটিতে। রানা দেখল রক্তে ভিজে গেছে খাকি ইউনিফরমটা পিঠের কাছে। কে মারল একে!

সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। কয়েক গজ দূরে মাটিতে পড়ে আছে আরেকজন সেনট্রি। ব্যাপার কি!

ঠিক এমনি সময় মাথার ওপরে দেয়ালের গায়ে বসানো একটা স্পীকার থেকে ভেসে এল একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর।

'রানা! সাবধান!! দ্বীপের সবাইকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি আমি, একটি গার্ডও বেঁচে নেই। ভয়ঙ্কর পাগলগুলোকে ছেড়ে দিয়েছি। দ্বীপময় ঘুরে বেড়াচ্ছে ওরা! এখন কি বাইরে বেরোনো ঠিক হচ্ছে?'

'ললিতা!' অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করল রানা।

'না। আমি ললিতা নই, ললিতার অশরীরী প্রেতাত্মা। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করব আমি আজ। প্রস্তুত হও, আসছি আমি, রানা! অন্ধকারে খুঁজে বের করে খুন করব আমি তোমাকে...'

দপ করে নিভে গেল দ্বীপের সমস্ত বাতি।

বারো

একলাফে দেয়ালের গায়ে সেঁটে গেল রানা। হঠাৎ এক অবর্ণনীয় ভয়ে ঘাড়ের কাছে মাথার চুলগুলো খাড়া হয়ে গেছে ওর। হিম হয়ে গেছে বুকের

ভিতরটা। ঝিক্ করে বিদ্যুৎ চমকে উঠল আকাশে।

কেউ নেই লম্বা করিডরে। সামলে নিল রানা নিজেকে। এখন ভয় পেলে চলবে না। প্রথম দরকার শায়লা এবং ডক্টর ফৈয়াজের নিরাপত্তা। দরজার কাছে চলে এল সে দেয়ালের গায়ে সেঁটে থেকে। ঘরে ঢুকেই দরজা ভিড়িয়ে দিল। ভিতর থেকে দরজা লাগাবার কোন উপায় নেই।

'কি হলো, রানা! আলো নিভে গেল কেন?' জিজ্ঞেস করল শায়লা।

'ললিতা ফিরে এসেছে দ্বীপে। গার্ডগুলোকে মেরে ফেলেছে সে, বাকি সবাইকে অজ্ঞান করে রেখে পাগলদের ছেড়ে দিয়েছে। এখন খুঁজে বের করে খুন করবে আমাকে।' অন্ধকারেও টের পেল রানা আঁতকে উঠল শায়লা। 'ভয় পেয়ো না। এই অন্ধকারে আমাদের চেয়ে ওর নিজের বিপদের সম্ভাবনা কম নয়। যে-কোনও পাগল ওকেও আক্রমণ করে বসতে পারে। আমাকে বেরোতে হবে।'

'কিন্তু ওর কাছে পিস্তল আছে, তুমি তো নিরস্ত্র, রানা,' বললেন ডক্টর ফৈয়াজ।

'এই অন্ধকারে পিস্তল থাকা না থাকা সমান কথা,' বলল রানা। এমন সময় হঠাৎ চিৎকার করে উঠল সাদেক খান। ওর কথা ভুলেই গিয়েছিল রানা। জিজ্ঞেস করল, 'ওর ওষুধ ঠিক কোনখানে পাওয়া যাবে বলুন, চেষ্টা করে দেখি।'

'ওষুধে কোনও কাজ হবে না, রানা। ব্রেন হেমোরেজ। মারা যাচ্ছে লোকটা। এক্ষুণি অপারেশন করতে পারলে হয়তো বাঁচানো যেত- কিন্তু...' কথাটা আর শেষ করলেন না তিনি। বুঝে নিল রানা, অন্ধকারে কিছুই সম্ভব নয় এখন। কাজেই মরতে দিতে হবে ওকে। এখন দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করবার ব্যবস্থা করেই বেরোতে হবে ওকে।

দুটো বেড টেনে দরজার কাছে নিয়ে এল রানা।

'কি করছ?' জিজ্ঞেস করল শায়লা ভীত কণ্ঠে।

মট করে একটা কাঠের চেয়ারের পায়া ভাঙল রানা। 'এইটা ধরো। আমি বেরিয়ে গেলে খাট দুটো ঠেলে চাপিয়ে দেবে দরজার গায়ে। যদি কেউ ভেতরে ঢুকবার চেষ্টা করে, এটা ব্যবহার করতে দ্বিধা করবে না।' আরেকটা পায়া ভেঙে হাতে নিয়ে সামনে পা বাড়াল রানা।

'কিন্তু তুমি কোথায় যাচ্ছ, রানা?'

'ললিতাকে খুঁজে বের করতে হবে। নইলে...' খিল খিল করে হেসে উঠল কেউ দরজার বাইরে। দুড়দুড় করে দৌড় দিল কে যেন দরজার সামনে দিয়ে। খামচে ধরল শায়লা রানার জামা। 'নইলে সকালে কোনও সাহায্য পৌঁছানোর আগেই মেরে ফেলবে ও আমাদের অতি সহজে।'

বেরিয়ে গেল রানা নিঃশব্দে। ঠাণ্ডা একটা দমকা হাওয়া লাগল ওর চোখে-মুখে। কড়াৎ করে বাজ পড়ল কাছেই কোথাও। নেমে এল রানা

নিচে। করিডরের শেষ মাথায় পৌঁছেই বুঝল ভুল হয়ে গেছে। দরজা বন্ধ। ঝিক করে বিদ্যুৎ চমকে উঠল। লম্বা করিডরটা ফাঁকা। ছুটে চলে এল রানা এপাশে।

দ্বিতীয় গেটের কাছাকাছি এসেই বিদ্যুতের আলোয় ভেজা পায়ের ছাপ চোখে পড়ল রানার। বাম ধারের প্যাসেজ ধরে চলে গেছে পদচিহ্ন। চেয়ারের ভাঙা পা-টা শক্ত করে ধরে এগোল রানা বিড়ালের মত নিঃশব্দ গতিতে।

সূচীভেদ্য অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না সামনে। প্যাসেজের শেষ মাথায় ধাক্কা খেল রানা একটা সুইং-ডোরের সাথে। রান্না ঘর। হঠাৎ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে 'ই…ই…হ্' বলে চিৎকার করে উঠল কেউ ঘরের মধ্যে। আন্দাজের ওপর পায়া চালাল রানা। খুব সম্ভব ঘাড়ের ওপর লাগল বাড়িটা। দড়াম করে মাটিতে পড়ল ভারি কোন বস্তু। বিদ্যুতের আলোর জন্যে কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করল রানা কয়েক পা ডাইনে সরে। চমকে উঠল বিদ্যুৎ। সেই আলোয় দেখল রানা ভীত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ওর দিকে এক বদ্ধ। সারা মুখে আধ ইঞ্চি লম্বা খোঁচা খোঁচা পাকা দাড়ি। রান্না ঘরে ঢুকে টিন খুলে ময়দা খাচ্ছিল। রানাকে দেখতে পেয়ে ধড়মড় করে উঠেই দৌড় দিল সে ঘর থেকে বেরিয়ে প্যাসেজ দিয়ে।

'টাশশ্!'

সুইং-ডোর ঠেলে বেরোতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। গগন বিদারী চিৎকার করে মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে পাগলটা।

জানালা টপকে বেরিয়ে গেল রানা রান্নাঘর থেকে। বৃষ্টির ছাঁট বিঁধছে এসে চোখে। পেছন দিয়ে ঘুরে যেতে হবে। দৌড়ে চলে এল সে সামনের গাড়ি বারান্দায়। আবার চমকে উঠল বিদ্যুৎ। কিছুই দেখতে পেল না রানা, কিন্তু পাছে ওকে কেউ দেখতে পেয়ে থাকে তাই ভেবে লাফিয়ে সরে গেল কয়েক হাত।

'টাশশ্!'

ছিটে এসে চুনসুরকি লাগল রানার চোখে-মুখে। মৃদু হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে। দেখতে পেয়েছে রানা কোথায় আছে ললিতা। দৌড়ে এগিয়ে গিয়ে দরজার আড়ালে দাঁড়াল রানা। কিন্তু কোথায় ললিতা? কয়েক সেকেণ্ড পর বিদ্যুৎ চমকে উঠতেই ভেজা পায়ের ছাপ ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না সে। সার্জারি ওয়ার্ডের দিকে চলে গেছে পায়ের চিহ্ন। ছুটল রানা সেদিকে।

কড়াৎ করে বাজ পড়ল আবার। একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। অর্ধেকটা আকাশ চিরে ঝলসে উঠল বিদ্যুৎ। সেই আলোয় পরিষ্কার দেখতে পেল সে ললিতার বীভৎস মুখটা। ব্যাণ্ডেজ করা বাম হাতটা ঝুলছে গলায় বাঁধা স্লিং থেকে। সার্জারির কাঁচ ভাঙা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে

চেয়ে খুঁজছে সে রানাকে।

আস্তে করে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল রানা। পাশের ঘরেই ললিতা। ঘরের মাঝামাঝি আসতেই তীক্ষ্ণ নারীকণ্ঠের বিজয় উল্লাসধ্বনি শুনতে পেল রানা। আবছা মত কি যেন ছুটে আসছে ওর দিকে। মাথা নিচু করতেই ঝনঝন করে একরাশ ছুরি কাঁচি লাগল গিয়ে পিছনের দেয়ালে।

একলাফে আলমারির আড়ালে সরে গেল রানা, সেঁটে গেল দেয়ালের সঙ্গে। ওপাশের জানালার কাছে সরে এসেছে ললিতা। বিদ্যুতের আলোয় পরিষ্কার দেখতে পেল রানা ওকে। ললিতাও দেখল রানাকে।

একটা গুলি এসে বিঁধল আলমারিতে রানার মাথার কয়েক ইঞ্চি ওপরে। লাফ দিয়ে সরে গেল রানা। একটা বেড প্যান ঠেকল পায়ে, নিচু হয়ে তুলেই ছুঁড়ে মারল সেটা জানালার দিকে।

ততক্ষণে সরে গেছে ললিতা জানালা থেকে। এবার রানা যে দরজা দিয়ে ঢুকেছে সেই দরজা দিয়ে একটা হাত এগিয়ে এল কয়েক ইঞ্চি, দেয়ালের সাথে সেঁটে থেকেই সরে গেল রানা অল্প কিছুদূর।

'টাশশ্!'

সাথে সাথেই ছুঁড়ল রানা চেয়ারের পায়া। খটাং করে লাগল গিয়ে পায়াটা পিস্তলের গায়ে। ছুটে চলে গেল সেটা ললিতার হাত থেকে খসে শান বাঁধানো মেঝের ওপর দিয়ে গড়িয়ে।

লাফিয়ে চলে এল রানা দরজার কাছে। রানা ভেবেছিল পিস্তলটা উদ্ধার করবার চেষ্টা করবে ললিতা, কিন্তু তা না করে এক লাফে নেমে গেল সার্জারির বারান্দা থেকে, প্রাণপণে ছুটছে সে মাঠের মধ্যে দিয়ে। দৌড় দিল রানা পিছন পিছন।

অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ব্লকের দিকে চলেছে ললিতা। হাওয়া আর বৃষ্টির বেগে কিছু দেখতে তো পাচ্ছেই না, শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে রানার। হঠাৎ একটা পাথরে পা বেধে পড়ে গেল। কপালটা ঠুকে গেল আরেকটা পাথরে। মাথাটা এদিক-ওদিক ঝাঁকিয়ে উঠে বসল রানা। ঠিক সেই সময়ই চোখে পড়ল ধ্বংসস্তূপের মধ্যে থেকে একটা দশ ইঞ্চি ইঁট তুলেছে ললিতা ওর মাথা লক্ষ্য করে। রক্ত বরফ করা একটা অমানুষিক চিৎকার দিয়ে ছুঁড়ল সে ইঁটটা। চট করে সরেই ডাইভ দিল রানা ললিতার দিকে। মাথাটা গিয়ে লাগল ললিতার পেটে। হুড়মুড় করে পড়ল দু'জন মাটিতে। গড়িয়ে চলে এল বৃষ্টির পানি জমা একটা অপেক্ষাকৃত নিচু গর্তমত জায়গায়। আ র্য হয়ে গেল রানা ললিতার শক্তি দেখে। কিছুতেই ধরে রাখতে পারছে না সে তাকে। ভিজে, কাদা মেখে পিচ্ছিল হয়ে গেছে ললিতার দেহ সিঙি মাছের মত। নিচে পড়েছিল ললিতা। দাঁত বসিয়ে দিল সে রানার বুকে। ধরে রাখতে পারল না রানা, পিছলে সরে গিয়ে আছড়ে-পাছড়ে উঠে গেল সে গর্ত থেকে। রানাও

ছুটল পিছন পিছন, কিন্তু পা পিছলে পড়ে গেল আবার।

দ্বীপের একটা ফাটল বরাবর একটা পোড়া বাড়ির দিকে দৌড়ে চলে গেল ললিতা। রানাও গেল পিছন পিছন, কিন্তু বাড়ির মধ্যে দেখতে পেল না কাউকে। অন্য কোথাও চলে গেছে ললিতা।

ইমার্জেন্সী জেনারেটারটা চালু করা যায় কিনা চেষ্টা করে দেখবে ভাবল রানা। আলো হলে খুঁজে বের করা যেতে পারে ওকে। কিন্তু ঘরের ভেতর ঢুকেই টের পেল রানা চালু আছে জেনারেটার। অন্য কোথাও থেকে সার্কিটটা নষ্ট করেছে ললিতা। এই অন্ধকারে সেটা খুঁজে বের করা অসম্ভব।

জেনারেটার ঘর থেকে বেরোতে গিয়েই থমকে দাঁড়াল রানা। তিনজন লোক দাঁড়িয়ে আছে দরজার সামনে। পাগল। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ভূতের মত দাঁড়িয়ে আছে ওরা রানার পথ বন্ধ করে, আর সামনে পিছনে দুলছে।

একটু হকচকিয়ে গেল রানা, কি করবে ঠিক করে উঠতে পারল না। আক্রমণাত্মক মেজাজে নেই ওরা এখন, কিন্তু জোর খাটাতে গেলেই খেপে উঠতে পারে। ধীরে ধীরে পিছিয়ে এল সে, তারপর ভেজা পুলওভারটা গা থেকে খুলে ফেলল। চেয়ে দেখল, নিজেদের মধ্যে কি কথা বলছে ওরা বিড় বিড় করে। জেনারেটার টারমিনালের ওপর ফেলল রানা ভেজা পুলওভার। ছ্যাঁৎ করে শব্দ হলো একটা, স্পার্ক হলো কয়েকটা, সেই সঙ্গে ধোঁয়ার সাথে একটা পোড়া-গন্ধ ছুটল। ভয়ানক চিৎকার করে সাথে সাথেই লাফিয়ে সরে গেল পাগলগুলো- তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রাণপণে ছুটল উল্টো দিকে।

বেরিয়ে এল রানা। কোথায় গেল ললিতা? ভয় পেয়ে পালাল, না অন্য কোনও মতলব আঁটছে সে? আচ্ছা, কিসে করে এসেছে ললিতা? লঞ্চে? আবার লঞ্চে করে পালাবার চেষ্টা করছে না তো সে? ছুটল রানা জেটির দিকে।

গেটের কাছে আরেকটা সেন্ট্রির মৃতদেহ দেখল রানা। ল্যাবরেটরি এরিয়া থেকে বেরিয়ে দৌড় দিল সে। কিছুতেই ওকে পালাতে দেয়া চলবে না।

বিদ্যুৎ চমকে উঠতেই দেখতে পেল রানা লঞ্চ। জেটিতে লেকের পারে প্রকাণ্ড ফুয়েল ট্যাঙ্কের একটা পায়ের সাথে বাঁধা আছে সেটা। চারফুট উঁচু ঢেউয়ের মাথায় নাচানাচি করছে কাগজের নৌকোর মত।

হঠাৎ কাছেই একটা ধস্তাধস্তির শব্দে একটা থামের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল রানা। আবার একবার গোটা আকাশ চিরে দিয়ে ত্রিশূলের মত বিদ্যুৎ বয়ে গেল এপাশ থেকে ওপাশে। সেই আলোয় দেখল রানা প্রকাণ্ড চেহারার একজন দাড়িওয়ালা উলঙ্গ লোক পেটের উপর চেপে বসে দুই হাতে টিপে ধরেছে ললিতার গলা। বদ্ধ পাগল একজন। হঠাৎ আক্রমণ করে অর্ধনগ্ন করে ফেলেছে ললিতাকে। শাড়ি ব্লাউজের কিছু কিছু অংশ চোখে পড়ল

রানার। ছটফট করছে ললিতা চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ে।

ছুটে গিয়ে ধাঁই করে এক লাথি মারল রানা পাগলটার পাঁজরের ওপর। কোঁক করে শব্দ বেরোল ওর মুখ থেকে, কিন্তু নড়ল না। আবার মারল রানা। এইবার ললিতাকে ছেড়ে উঠে দাঁড়াল পাগলটা। একহাতে ধরে ফেলল রানাকে। পাগলের গায়ে অসম্ভব শক্তি, জানে রানা, কিন্তু কতখানি জানা ছিল না ওর।

হাঁটু দিয়ে মারল রানা ওর তলপেটে। ঘোঁৎ করে শব্দ করল কিন্তু হাত আলগা করল না সে। এক হ্যাঁচকা টানে মাটিতে ফেলে দিল রানাকে। মাটিতে পড়েই পা চালাল রানা। পাগলটাও পড়ল ওর পাশে, পড়েই টিপে ধরল রানার গলা। প্রথমে একহাতে, তারপর বুকের উপর উঠে বসে দুই হাতে। বাইরের দিক থেকে লোকটার দুই কনুই ধরে জোরে চাপ দিল রানা। 'আউ…শ' বলে ছেড়ে দিল সে রানার গলা। এবার হাত মুঠো করে মাঝের আঙুলটা আধ ইঞ্চি সামনে বাড়িয়ে রেখে মারল রানা লোকটার থুতনির নিচের নার্ভ সেণ্টারে। পাগলরা ব্যথা কম পায়, কিন্তু এই আঘাত সহ্য করা মুশকিল। ভয় পেল এবার লোকটা, উঠে দাঁড়াল রানাকে ছেড়ে। শুয়ে শুয়েই লাথি চালাল রানা ওর ঊরুর পিছনের নার্ভ সেণ্টারে। রানা উঠে বসবার আগেই ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিল লোকটা ঝড়-বৃষ্টি তুচ্ছ করে।

কোথায় ললিতা? আবছা মত দেখতে পেল লোহার মই বেয়ে ট্যাঙ্কের ওপর উঠে যাচ্ছে ললিতা। প্রকাণ্ড একটা নিশাচর বাদুড়ের মত লাগছে ওকে দেখতে। মই বেয়ে উঠতে আরম্ভ করল রানা। চল্লিশ ফুট উঠবার আগেই দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল ললিতা। একটা গোল প্ল্যাটফরম আছে প্রকাণ্ড ফুয়েল ট্যাঙ্কটাকে ঘিরে। সাবধানে এগোল সে।

একটা বাঁক ঘুরতেই দেখতে পেল রানা লেকের দিকে মুখ করে চুপচাপ রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে ললিতা বটব্যাল। বিদ্যুৎ চমকে উঠল ওর বীভৎস মুখ দেখে। করুণা হলো রানার। সত্যিই অপূর্ব সুন্দরী ছিল সে এক সময়। উদ্দাম হাওয়ায় ভেজা চুলগুলো উড়ছে ললিতার। সাবধানে এগোল রানা, আঘাত না করে কোনমতে বন্দী করতে চায় সে ওকে।

রানা কাছে আসতেই ঝট করে ফিরল ললিতা রানার দিকে।

'ভেবেছ ধরে ফেলেছ আমাকে, না?' হাসল ললিতা। 'তোমাকে এইখানে নিয়ে এসেছি কেন জানো?' মুখের কাছে ডান হাত নিয়ে কি যেন করছে ললিতা।

বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে গেল রানার চোখ। ললিতার হাতে একটা হ্যাণ্ড গ্রেনেড।

এবার খিল খিল করে উন্মাদিনীর মত হেসে উঠল ললিতা। হাসি আর থামতেই চায় না। অনেক কষ্টে সামলে নিয়ে বলল, 'মরতে আমাকে হতই-

নিজের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে গিয়ে দেশের অনেক ক্ষতি করেছি আমি। কিন্তু এইভাবে মরতে বড় আনন্দ হচ্ছে আমার রানা। বিশেষ করে যখন নিজের সাথে তোমাকেও শেষ করে দিয়ে যেতে পারছি, তখন এ আনন্দের তুলনা নেই।'

দাঁত দিয়ে কামড়ে পিন খসিয়ে ফেলল ললিতা। চেপে ধরল গ্রেনেডটা নিজের পেটের ওপর। আঁতকে উঠে পিছিয়ে গেল রানা এক পা। কিন্তু দু'জনের দূরত্ব এতই কম যে নির্ঘাত মৃত্যু ঘটবে ওর বোমাটা ফাটলে। দৈবক্রমে সঙ্গে সঙ্গে যদি মৃত্যু না-ও হয়, দুই মিনিটের মধ্যে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে ওদের দেহ হাজার হাজার গ্যালন তেল ভর্তি ট্যাঙ্কে আগুন ধরে গিয়ে।

চিন্তা করবার সময় নেই। ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা নিচে। কতখানি পানি আছে কে জানে! পাথরের ওপর পড়ে মাথাটা চৌচির হয়ে যাবে না তো?

ফাটল হ্যাণ্ড গ্রেনেড। রানা তখন পানির তলায়। ওপরে ভেসে উঠবার আগেই আগুন দেখতে পেল রানা। চারপাশে আলো। মাথা তুলে দেখল দাউ দাউ করে জ্বলছে ফুয়েল ট্যাঙ্ক। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই খসে পড়ল ট্যাঙ্কের এক অংশ। তেল পড়ছে লেকে, দ্রুত এগিয়ে আসছে আগুন রানার দিকে।

উত্তাল ঢেউয়ের সাথে যুদ্ধ করে প্রাণপণে সাঁতার কেটে পালাচ্ছে রানা ওই নরকের আগুন থেকে। হঠাৎ মনে পড়ল লঞ্চটার কথা। এগোবার চেষ্টা করল সে লঞ্চটার দিকে, কিন্তু প্রবল স্রোত টেনে নিয়ে যেতে চাইছে ওকে লেকের মাঝখানে।

গার্ডদের ব্যারাকগুলোতেও ধরে গেছে আগুন। চারদিকে আগুন ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না রানা। ক্রমে ছড়িয়ে পড়ছে আগুন সমস্ত দ্বীপে। পানির ওপর দিয়ে এগিয়ে আসছে আগুন তা-থৈ তা-থৈ উদ্বাহু নৃত্য করতে করতে। হঠাৎ রানা দেখতে পেল চোখের সামনে চড়াৎ করে দু'ফাঁক হয়ে গেল দ্বীপটা। কাত হয়ে পড়ে গেল ফুয়েল ট্যাঙ্কটা মাটিতে।

হেরে যাচ্ছে রানা ঢেউয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে। ক্রমেই চলে যাচ্ছে সে স্রোতের টানে। হাত দুটো ভারি হয়ে এল, চোখে ঝাপসা দেখছে সে এখন। অনেকদূর সরে এসেছে সে দ্বীপ থেকে। উত্তাল তরঙ্গ, ঝড়বৃষ্টি আর স্রোতের সঙ্গে যুদ্ধ করে দ্বীপে পৌঁছতে পারবে না সে কিছুতেই। আরও একবার দু'বার চেষ্টা করল রানা সামনে এগোবার। তারপর জ্ঞান হারাল কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে। ছয় সাত হাত পানির নিচে চলে গিয়েছিল সে, প্রাণপণ চেষ্টায় উঠে এল আবার ওপরে। বাতাসের অভাবে বুকের ছাতি ফাটবার উপক্রম হয়েছে। উপরে উঠেই হাঁ করে শ্বাস নেবার চেষ্টা করল রানা। একরাশ পানি ঢুকল মুখের ভিতর। ফুসফুসে চলে গেল খানিকটা। প্রবল বেগে কেশে উঠল সে। আবার তলিয়ে গেল বড় একটা ঢেউয়ের

তলায়। আবার উঠল। আধমাইল সরে এসেছে সে জ্বলন্ত দ্বীপ থেকে।

হঠাৎ বিদ্যুতের আলোয় চোখ পড়ল ওর লঞ্চের ওপর। চমকে উঠল রানা। দশ গজ দূর দিয়ে ভেসে চলে যাচ্ছে লঞ্চটা। রশি পুড়ে যাওয়ায় ছুটে এসেছে সেটা। রূপকথার ফ্লাইং ডাচম্যানের জাহাজের মত জনশূন্য লঞ্চটা ভেসে বেড়াচ্ছে যেন সমুদ্রে। একাকী, নিঃসঙ্গ।

নতুন প্রাণের সঞ্চার হলো রানার মধ্যে আশার আলো দেখতে পেয়ে। ডুব সাঁতার দিয়ে এগোল সে লঞ্চটার দিকে। তিন মিনিট চেষ্টার পর লঞ্চের দড়িটা ধরতে পারল। ওটা ধরে ঝুলে বিশ্রাম নিল আধ মিনিট, তারপর উঠে এল ওপরে।

পনেরো মিনিটের মধ্যে দ্বীপের জেটিতে এসে পৌঁছল লঞ্চ। একটা খুঁটির সঙ্গে লঞ্চের দড়ি শক্ত করে বেঁধে ছুটল সে ওয়ার্ডগুলোর দিকে। গার্ডদের ব্যারাক ভস্ম হয়ে গেছে। অসম্ভব তাপ লাগছে রানার চোখে-মুখে। ছড়িয়ে পড়ছে আগুনটা দ্বীপের চারদিকে। কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ছুটে চলল রানা। আগুনে একটা সুবিধা হয়েছে, দেখা যাচ্ছে সবকিছু পরিষ্কার। তিন ফুট ফাঁক হয়ে গেছে দ্বীপের ফাটলটা। সেটা টপকে আবার ছুটল সে প্রাণপণে। প্রথম গেটটা পেরোতেই চড়চড় করে আরেকটা ফাটল সৃষ্টি হলো গেটের বাইরে। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল রানা সাপের মত এঁকেবেঁকে দ্বীপ জুড়ে সৃষ্টি হচ্ছে আরেকটা মৃত্যু গহ্বর।

দোতলায় উঠেই ধাক্কা দিল রানা দরজায়।

'দরজা খোলো, শায়লা! আমি রানা।'

রানাকে দেখে ঝাঁপিয়ে পড়ল শায়লা ওর বুকের ওপর।

'আমি…আমি মনে করেছিলাম খুন করেছে তোমাকে ওই মেয়েলোকটা।'

'কি হয়েছে রানা? দুলছে কেন দ্বীপটা? আগুন লাগল কি করে?' ডক্টর ফৈয়াজ এসে একটা হাত ধরলেন রানার। তিনিও কল্পনা করতে পারেননি আবার দেখতে পাবেন রানাকে।

'জলদি চলুন। যে-কোন মুহূর্তে তলিয়ে যেতে পারে দ্বীপটা। লঞ্চ আছে জেটিতে। সব কথা পরে শুনবেন। সাদেক খানের অবস্থা কি?'

'মারা গেছে কিছুক্ষণ আগে।'

'বাঁচা গেল। ওকে নিয়ে মুশকিলই হত। চলো, শায়লা, দৌড়াতে হবে আমাদের।'

তিনফুট ফাঁকটা এখন ছয়ফুটে দাঁড়িয়েছে। ভিতরে গভীর অন্ধকার। প্রথমে ডাক্তার ফৈয়াজকে নিয়ে লাফ দিল রানা, তারপর শায়লার ছুঁড়ে দেয়া হুইল চেয়ারটা ধরে নামিয়ে রেখে আবার টপকে এসে শায়লাকে নিয়ে লাফিয়ে পার হয়ে গেল গহ্বরটা।

লঞ্চে উঠেই শায়লা বলল, 'এবার কোনদিকে?'

দড়ি খুলে দিয়েই এঞ্জিন স্টার্ট দিল রানা। বলল, 'লেক থেকে একটা সরু নদী বেরিয়ে পড়েছে গিয়ে ভারত সাগরে। ওই পথে চলে যাব আমরা। মোগলতুররা পেরোলেই নরসাপুর। ওখানে অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে একটা সাবমেরিন। এই ঝড়ের রাতে আজ আর হেলিকপ্টারের ভয় নেই।'

হাসল শায়লা। ডক্টর ফৈয়াজকে কেবিনে শুইয়ে দিয়ে ফিরে এসে একটা হাত রাখল সে রানার কাঁধে। গাল ঠেকিয়ে গিজগিজে দাড়ি দিয়ে ঘষে দিল রানা হাতটা।

'অ্যাই, শয়তান।' পিছন থেকে রানার মাথাটা জড়িয়ে ধরল শায়লা ওর বুকের মধ্যে। ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে সে রানার চুলে।

দ্বীপটার পুব পাশে পৌঁছতেই অস্পষ্ট আলোয় একজন মানুষের চেহারা দেখতে পেল রানা। সার্চ লাইট জ্বালতেই কবীর চৌধুরীকে পরিষ্কার দেখতে পেল ওরা। তীরে দাঁড়িয়ে চেয়ে রয়েছে সে ওদের দিকে। লঞ্চটার মুখ ঘুরিয়ে দিল রানা দ্বীপের দিকে।

কিন্তু ঘাট থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে থাকতেই প্রচণ্ড একটা শব্দে কানে তালা লেগে গেল রানার। মহাপ্রলয় হচ্ছে যেন ওঙ্কার দ্বীপে। হুড়মুড় করে ধসে যাচ্ছে দ্বীপটা।

কোলায়ের লেকের বুকে প্রকাণ্ড কয়েকটা ঢেউ তুলে তলিয়ে গেল ওঙ্কার দ্বীপ। সেই সঙ্গে তলিয়ে গেল কবীর চৌধুরী। আধঘণ্টা ধরে এদিক ওদিক সার্চ লাইট ফেলে খুঁজল রানা কবীর চৌধুরীকে। পাওয়া গেল না।

সোজা পুব দিকে ছুটল এবার লঞ্চ ওঙ্কার দ্বীপের ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নকে পিছনে ফেলে।

- ০ -